বেদনালব্ধ প্রেমের সংহত আবেগে স্নিগ্ধ কয়েকটি সাধারণ চরিত্রের পুরুষ ও নারীর অসাধারণ হৃদয় এবং বিচিত্র মানসিকতার উজ্জ্বল প্রতিফলন 'সিন্ধু বারোয়াঁ' আধুনিক মানসের পরিপ্রেক্ষিতে আবহমান সত্যের অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় রূপায়ন—জীবন-জিজ্ঞাসার বিস্তীর্ণ পরিসরে নিরবধিকাল দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে প্রবাহিত নদীর মতো একটি ধারাকে আকাঙ্ক্ষিত সমুদ্রের সন্ধান দিতে পেরেছে। সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যে শক্তিমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তরুণ হয়েও বিষয় ও শৈলীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দিব্যেন্দু পালিত সপ্রতিভ। এই সরস সুন্দর শুচিস্নিগ্ধ প্রেমের উপন্যাস তাঁর পরিণত পরিচয়॥

সি | ন্ধু | বা | রো | য়া

সিন্ধু বারোয়াঁ

দিব্যেন্দু পালিত

আ ভে নি র
২৩৮বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৯

আমার স্বর্গত বাবা-কে

শুরু হয়েছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে। মাঝে হলিউড্, ক্রিকেট্, রুশীয় সমাজ ব্যবস্থা, ব্রিজিট্ বার্ডোট্ ইত্যাদির অনায়াস ও বন্ধুর পথ পেরিয়ে এই এতক্ষণে, অপরাহ্ণ তিনটে বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট একুশ সেকেণ্ডে, বিদেশী সাহিত্যে এসে থেমেছে। ডিলান টমাসের কজন প্রেমিকা ছিল, এই প্রশ্নটা উঠতে গিয়েও উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে চাপা পড়ে গেল। আপাতত সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ নিয়ে শূন্য ও শুষ্ক কফির পেয়ালায় তুমুল তর্কের ঝড় উঠেছে। কফিহাউসের রহস্যই এই। বনেদি আলোচনা ছাড়া কেউ স্বাভাবিক হতে পারে না। গতি দেখে মনে হয় সার্ত্রেও আর বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবেন না। আলোচকদের আন্তরিক রসদ ফুরিয়ে এসেছে। সিগারেটে টান দিয়ে একজন গভীর ও গম্ভীর হতে চেষ্টা করল। খাপছাড়াভাবে একজন প্রশ্ন করল, সৌম্য, তুমি কি অসামু দাজাইয়ের শেষ উপন্যাসটি পড়েছ?

প্রশ্নটা শুনেও শুনল না সৌম্য। কপালে দু-তিনটে সরু সরু খাঁজ ফেলে ও মলিনাকে লক্ষ্য করছিল। দর্শনের ছাত্রী মলিনা। আজকের আলোচনায় সব চাইতে বেশি কথা বলেছে, এবং সাহিত্যের প্রসঙ্গটাকে এখনো বাঁচিয়ে রাখবার করুণ চেষ্টা করছে। ওটা এক ধরণের আত্মপ্রসাদ। জিজ্ঞেস করলে বলবে, সাহিত্যিকরা কি দার্শনিক নন! বলে একটু হাসবে। যেন হাসিটাই ওর সৌন্দর্য। সময়ে সময়ে মেয়েদের এমন অসহ্য রকমের বিশ্রী ও বিরক্তিকর মনে হয়।

প্রথম দিকের আলোচনায় সৌম্যও কিছু কিছু কথা বলেছিল। খুব বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিল। পরে বুঝল, সবই অরণ্যে রোদন! এখন ঠিক ততখানি নিরুৎসাহ। ভাবছিল, এইবার উঠলেই হয়। বাইরে, কলেজ স্ট্রীটে এখন রোদ পড়ে এসেছে। কলকাতার পথে কৃষ্ণচূড়া নেই। থাকলে বেশ হত।

মলিনার মুখটা টসটসে। গালে একটা পাকা ব্রণ। ঠোঁট দুটো ফাটা ফাটা, খসখসে। এখন মাড়ি বের করে হাসছে। সৌম্য চোখ ফিরিয়ে নিল।

মলিনা বোধহয় সৌম্যর দৃষ্টিটা লক্ষ্য করেছিল। বাঁ হাতে গালের ব্রণটা আড়াল করে বলল, কি ব্যাপার, সৌম্য, তুমি যে বড্ড চুপচাপ!

অন্যমনস্কভাবে সৌম্য বলল, চল, ওঠা যাক এবার।

সৌম্যর সঙ্গে সঙ্গে মলিনাও উঠল। ইদানিং বিশ্ববিদ্যালয়ে গুজব, ইংরেজীর সৌমিত্র বসুর সঙ্গে দর্শনের মলিনা মিত্রের জোর রোমান্স্ চলেছে। মলিনা অবশ্য মেয়েদের কমনরুমে তার বন্ধুদের বলেছে, রোমান্স্ ছাড়াও সমুর অন্য চিন্তা আছে। আড়ালে, বিশেষতঃ বিহ্বল মুহূর্তে, সৌম্যকে ও 'সমু' নামে ডাকে।

কফিহাউস থেকে বেরবার আগেই সৌম্যব অন্তরঙ্গ বন্ধু অতনু ধরে ফেলল। বললে, একটা বিশেষ কথা আছে, একটু সময় লাগবে। আয় আমাব সঙ্গে।

অতনু মলিনাব দিকে তাকাল। মলিনা সৌম্যকে দেখল। সৌম্য তাকাল দুজনের দিকে। মলিনা বুঝল, অতনু তাকে সরাতে চাইছে। অসহিষ্ণু স্বরে বলল, আমি যাই, সৌম্য। তুমি না হয় পবে এস।

জুতোর হিলে অনাবশ্যক শব্দ তুলে বেবিয়ে গেল মলিনা।

অতনুব সঙ্গে এইবাব যেখানে এল, সেখানে আর কিছু না থাকুক, সৌন্দর্য ছিল। যদিও কফিহাউসঃ সেই চেয়ার, সেই টেবিল, কথা, আলোচনা, শব্দ। হাতের তেলোয় চিবুক পেতে, নতোমুখে অগোছাল ভঙ্গীতে একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল মেয়েটি। সুন্দরী নিঃসন্দেহে। সৌম্য চিনতে পারল না।

—এস, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। অতনু বললে, সৌম্য, ইনি হলেন জয়ন্তী সেন, আমাদেবই সহপাঠিনী, বাংলায়। আর, জয়ন্তী, সৌমিত্রর কথা তুমি আগেই শুনেছ।

সৌম্য হাত তুলে নমস্কার জানাল। জয়ন্তীও ঠোঁট খুলল। নবম মুগ্ধ হেসে বলল, আপনার নাম অনেক শুনেছি, ইউনিভার্সিটিতেও দেখেছি আপনাকে। কিন্তু আলাপ করবার সৌভাগ্য এতদিনে হল।

সৌম্য বললে, আমাকে কিন্তু একটা দুর্ভাগ্যের কাহিনী শোনাতে হচ্ছে। খুব কাছের জিনিস অনেক সময় দৃষ্টির দূরত্বে হারিয়ে যায়। কেন এমন হয়, তা অবশ্য জানিনে। তবে এতদিন আপনাকে কেন যে চোখে পড়ে নি, তাই ভাবছি!

সৌম্যর কথার ধরণে স্ফীত ও আরক্ত হবে কিনা এক মুহূর্ত ভাবল জয়ন্তী। তারপর লজ্জিতভাবে বলল, চোখে না-পড়াটা কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই নয়। কারণ বছর মাঝে আমি অনন্যা নই।

সেই মুহূর্তে কোনো জবাব দিতে পারল না সৌম্য। মৃদু হেসে চুপ করে গেল।

অতনু বললে, জয়ন্তী, সৌম্যর লেখার তুমি একজন ভক্ত পাঠিকা না?

জয়ন্তী তাকিয়ে ছিল সৌম্যব বাঁ হাতের আঙুলগুলির দিকে। অতনুর কথা শুনে সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট রেখায় সম্মতির হাসি হাসল।

সৌম্য বলল, বিস্মিত হব কিনা ভাবছি, অতনু! আমার লেখা আব কেউ পড়েন, এবং পড়ে মনে রাখেন, সে-কথা এই প্রথম শুনলাম।

কথাগুলি অতনুব উদ্দেশ্যে বলা হলেও, সৌম্যর লক্ষ্য ছিল আব কেউ, বিশেষ কেউ। জয়ন্তী তা বুঝল।

চোখ না তুলেই জয়ন্তী বলল, অকাবণে বিনয়ী হওয়াটা আপনার অন্যতম গুণ বা দোষ?

সৌম্য হেসে বলল, সম্ভবত গুণ। দুইয়েব নির্বাচনে প্রথমই সমর্থন পাবে বেশি। সুতরাং বিনা প্রতিবাদে গুণটাকে স্বীকাব করে নেওয়াই ভালো। কিন্তু, আমাব লেখা সত্যিই আপনাব পছন্দ হয়?

জয়ন্তীর চোখে ঝিক্ কবে একটা আলোব দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ল। ফরসা, সুন্দব গ্রীবা দুলে উঠল ঈষৎ। হেসে হেসেই জয়ন্তী বলল, তবে আপনাব বিরুদ্ধে গুরুতব অভিযোগ আছে।

—কী বকম।

—কিছু মনে করবেন না, আপনাব লেখা পড়ে মনে হয়, মেয়েদের ওপর আপনাব বাগ, ঠিক রাগও হয়তো নয়, অভিমান যেন একটু বেশি!

সৌম্য একটু দ্বিধান্বিত হল। জয়ন্তীব মুখেব ভাষাটা তীব্র হলেও খানিকটা স্পর্শেব ছোঁয়া যেন তাতে আছে। একটু ভেবে বলল, আপনাব প্রশ্নের জবাবটা কী ভাবে দিলে খুশি হবেন, বুঝতে পারছি না। যাদের ভালবাসা যায়, তাদেব ওপর একটু অভিমান করা কী অন্যায়?

জয়ন্তী কোনো সাড়া দিল না, চোখ তুলল না, কেঁপেও উঠল না। এক পলক সেদিকে তাকিয়ে থেকে সৌম্য বললে. আমাব প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনো পাই নি।

অস্ফুট স্বরে জয়ন্তী বলল, বুঝতে পারছি না, কি বলব।

দুজনেই হেসে উঠল এক সঙ্গে।

অতনু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এইবার বলল, তোমরা দুজনে তো বেশ জমে উঠেছ দেখছি। আমিও যে উপস্থিত রয়েছি, আমারও যে একটা ভূমিকা আছে; তা বোধহয় তোমরা ভুলে গিয়েছ।

সৌম্য হেসে বলল, না, ভুলিনি। তোমার ভূমিকাটি যে নেহাত গৌন নয়, তা বিলক্ষণ মনে আছে। কিন্তু, অতনু, আজ আমার ওঠা দরকার। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বিব্রত কণ্ঠে অতনু বলল, আর একটু বসবি না?

সৌম্য বলল, না, আজ থাক্।

জয়ন্তী এতক্ষণ এক দৃষ্টিতে সৌম্যব মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সহসা চোখাচোখি হতেই উষ্ণ হয়ে মুখ নিচু কবল।

সৌম্য বলল, আজ তাহলে চলি, জয়ন্তী দেবী?

জয়ন্তীর সঙ্কোচ বুঝি তখনো কাটে নি। মৃদু হেসে বলল, আবার দেখা হবে।

সৌম্য উঠে দাঁড়াল। কিন্তু জয়ন্তী চোখ তুলল না। আরক্ত মুখে খাতাব উপর হিজিবিজি আঙুল ঘষতে লাগল শুধু।

সৌম্য চলে গেলে অতনু বলল, সৌম্যর কথায় তুমি কিছু মনে করলে না তো, জয়ন্তী?

আস্তে আস্তে সহজ হয়ে জয়ন্তী বলল, না, মনে করবাব মতো কিছুই তিনি বলেন নি।

অল্প হেসে, প্রায় কৈফিয়তের সুরে অতনু বলল, সৌম্যকে যা দেখছ, ও ঠিক তাই। সহজ, অনায়াস, অথচ গভীব। ওকে যেন ঠিক ধরা যায় না, ছোঁয়াও যায় না। তাই ওকে খুব তাড়াতাড়ি কেউ বুঝতে পাবে না। চট্ করে একটা যা-তা সন্দেহ করে বসে।

শান্ত কণ্ঠে জয়ন্তী বলল, না, তেমন কোন সুযোগ আমি পাই নি। তাছাড়া, আলাপের আগ্রহটা তো আমারই ছিল।

অতনুর হাসিটা এবার ঠোঁট থেকে মুখে, এবং মুখ থেকে চোখে ছড়িয়ে পড়ল। বলল, তোমার কথা জানি না। তবে, সত্যি কী জান, সৌম্য যেন দুর্বোধ্য, ওর সারাংশ খুঁজে বের করা কখনো বুঝি সম্ভব নয়। কথা

শুনলে মনে হবে, প্রতি শব্দে যেন অহংকারের ঝঙ্কার বেজে উঠছে; কিন্তু আমি ওকে জানি। ওর চেয়ে সরল হতে পারা যায় না। [illegible] [illegible] আমার মনে হয়েছে, ও একটা ছোট ভাসমান খড়কুটোর মতন; বিশাল সমুদ্রের বুক ছুঁয়ে হাসছে, ভাসছে, খেলা করছে, কিন্তু সমুদ্র তাকে অসংখ্য বাহু মেলেও আকর্ষণ করতে পারছে না, গ্রাস করতে পারছে না!

—বল কী, অতনু! জোর করে হেসে জয়ন্তী বলল, তুমি যে সৌম্যর চেয়ে বেশি দুর্বোধ্য হয়ে উঠলে। এমন সুন্দর উপমা তো তোমার কথায় এব আগে খুঁজে পাই নি।

লজ্জিতভাবে অতনু বললে, বলতে পাব। তবে কথা আর উপমা কোনটিই আমার নিজস্ব নয়। কি যেন বোঝাতে গিয়ে সৌম্যই একদিন বলেছিল। সুযোগ বুঝে আজ ওব ওপবেই তা প্রয়োগ করলাম।

জয়ন্তী বলল, তবু ভালো। আমি ভাবলুম অন্য কিছু।

অতনু বলল, না। তবে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন। প্রথম পবিচয়েই সৌম্যকে তুমি মুগ্ধ করেছ, ওর প্রতিটি কথা শুনে আমি তা বুঝেছি।

চোখ নিচু করেই জয়ন্তী বলল, না, না। তা মনে কববাব কিছুই নেই।

শেষেব দিকে জয়ন্তীব গলাব স্বর মন্থর হয়ে এল।

বিকেলেব কফিহাউস। টেবিলেব কাপে কাপে ঝড উঠছ। অসাবধানে কে একজন জোবে হেসে উঠেই হঠাৎ চুপ কবে গেল। আবার সেই একটানা পুরনো শব্দ, নিঃসঙ্গ মাছিব গুঞ্জনেব মতো।

কিছুক্ষণ চুপ কবে থাকবাব পব মৃদু গলায় অতনু বলল, চল, আমরাও উঠি।

জয়ন্তী বলল, চল।

কফিহাউস থেকে বেবিয়ে, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটে পা দিয়ে সৌম্য ভাবল, কোথায় যাবে। সাড়ে চারটে বাজে প্রায়। এখন অনায়াসে বাড়ি ফেরা চলে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বাডি ফিবতে ইচ্ছে করছে না। ট্রামে-বাসে পাঁচ মিনিটের পথ শ্যামবাজার। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।

তার চেয়ে বরং হেঁটেই যাওয়া ভালো।

ইচ্ছে মতন আস্তে আস্তে ঘরমুখো হাঁটতে শুরু করল সৌম্য।

কলেজ স্ট্রীটের ব্যস্ততার আবহাওয়াটা এই সময় অনেক বেশি সরব ও চঞ্চল। স্কুল কলেজের ছুটি হয়েছে। রাস্তায় প্রচুর ভিড়। বিকেলের ছুটির শেষে এই বাড়ি-ফেরা ছুটোছুটি দেখতে বেশ ভালো লাগছিল সৌম্যর।

চলতে চলতেই হঠাৎ চমকে উঠল সৌম্য। থেমে দাঁড়াল। ওদিকের ফুটপাথে ওয়াই-এম-সি-এ'র কাছে দাঁড়িয়ে মলিনা তাকে লক্ষ্য করছে। কতক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কে জানে! লজ্জিত হয়ে দ্রুত রাস্তা পার হল সৌম্য।

কাছে এসে দাঁড়াতেই ঠোঁট টিপে হাসল মলিনা। সৌম্য দেখল, মলিনার হাসিটা ভুরুর কাছে কেমন একটু বেঁকে গিয়েছে। ঠোঁট দুটো কঠিন।

—তুমি এখনো বাড়ি যাও নি? সৌম্য প্রশ্ন করল।

মলিনা বলল, যাই নি যে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। না কি, আমার অস্তিত্বটাই এখনো তোমার চোখে পড়ছে না!

সৌম্য বলল, তা বটে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে করছ কি তুমি?

মলিনা হাসল একটু। এবার ওর হাসিটা সময় নিয়ে চোখের কোণে দুলতে লাগল। অপলকে কিছুক্ষণ সৌম্যর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মলিনা বলল, জয়ন্তী সেন বুঝি এতক্ষণে তোমায় মুক্তি দিল?

সৌম্য হেসে বলল, না, মুক্তি চাইতে হল আমাকে, তবে পেলাম। পরিবর্তে আবার বাঁধা পড়বার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে মলিনা বলল, হেস না, সৌম্য! সব সময় অমন ছেলেমানুষের মতন হাসি ভালো নয়। আশ্চর্য, তুমি কি কখনো গম্ভীর হতে পার না!

—তাহলে হয়তো হাসতে পারতুম না। দুটো দিক তো সামলানো যায় না। একটা ত্যাগ সব সময়েই করতে হয়। কিন্তু, ব্যাপার কি, মলি! তোমার মনটা যেন একটু মেঘলা হয়ে রয়েছে?

—ভয় নেই, বৃষ্টি হবে না। আমি ভাবছি, তোমার ওই সরল মনে ঝড়ো হাওয়া সহ্য হবে কিনা! জয়ন্তী সেনকে তো তুমি চেন না!

—জয়ন্তীর ওপর তুমি খুব প্রসন্ন নও, না?

—তাতে তোমার কিছু যায় আসে না। তোমার যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেইজন্যেই বলছি। জয়ন্তীকে তুমি চেন না।

ফুটপাথের ভিড়ে একটি চেনা-মুখ হেঁটে যাচ্ছিল। এক মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল দেখাল মলিনাকে।

একটু চুপ করে থেকে সৌম্য জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে! না যাবে কোথাও?

মলিনা যেন একটু আহত হল। নিস্তেজ, বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, দাঁড়াবার জন্যে তো আসি নি। ওই, আমার বাস আসছে। আমি ও-ফুটে যাই।

সৌম্য দেখল, মলিনা তার চোখের সম্মুখ দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। বাস এল। চলেও গেল মলিনা।

নীরবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সৌম্য। মনটা হঠাৎ কেমন খারাপ লাগছে। মলিনা যেন কিসের একটা ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিল! অনেক ভেবেও কোন সূত্র খুঁজে পেল না সৌম্য।

উত্তরগামী একটা ডবল ডেকাব চাপা, বেসুরো আর কর্কশ শব্দ করে একেবাবে তার সম্মুখে এসে ব্রেক কষল। যাত্রীরা নামছে, ব্যস্তভাবে ওঠবার চেষ্টা কবছে। ভিড, ঠেলাঠেলি। মলিনার কথার মানে খুঁজে তাব কী লাভ, ভাবল সৌম্য। মলিনাব মনের সন্দেহের সঙ্গে তার তো কোন সম্পর্ক নেই। এবং জয়ন্তীব সঙ্গেও তাব কোন শত্রুতা নেই। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগেকাব একটা আলাপেব পবিচয়, জয়ন্তীব সঙ্গে তার সম্পর্কেব ইতিহাস তো এইটুকুই!

না, অনর্থক এই চিন্তার কোনো মানে হয় না।

পরের বাসটি এসে দাঁডাতেই সৌম্য আব দেবি করল না।

স্টপে নেমে ভিতর দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে বাড়ি। মন্থর পায়ে হাঁটছিল সৌম্য। হঠাৎ একটা বিশ্রী হাসি কানে আসতেই চমকে উঠল। সামনেই 'পপুলার কেবিন'। রেষ্টুরেন্ট তো নয়, নবক। পাড়ার এবং বে-পাড়ার যতো খারিজ, ইতর, বখাটে ছেলের আড্ডা। ভুরু কুঁচকে মনে মনেই একটা স্বগতোক্তি করল সৌম্য। তাবপর এগিয়ে গেল।

বাড়িতে ঢুকে হাত-মুখ ধুল সৌম্য। কাপড়, জামা বদলাল। ঘণ্টা তিনেকের জন্য এখন একেবারে নিশ্চিন্ত। সামান্য কতকগুলি কাজের

অদল বদলে মনটাও যেন নতুন করে সাজিয়ে নিয়েছে নিজেকে। ঋজু, লঘু, স্বচ্ছ, খুশি।

দোতলায় নিজের পড়ার ঘরের সম্মুখে ছোট্ট একটুকরো জায়গাটায় এসে দাঁড়াল সৌম্য। ছটা বাজতে চলল। অথচ রোদ্দুর এখনো একটুকু মলিন হয় নি। অল্প দূরে হলুদ-রঙ প্রকাণ্ড উঁচু বাড়িটার বাগানে সুপারি গাছের মাথায় বিকেলেব রোদ ঝলমল করছে। পরিচ্ছন্ন আকাশে কয়েক খণ্ড মেঘ। রাস্তা দিয়ে একটা ফেরিওলা ডেকে গেল, কান্নার মতো তার চিৎকারের শব্দটা গুমরে গুমরে মিলিয়ে গেল অনেক দূরে। আর হলদে বাড়িটার ছাদে পায়চারি করে কবে গল্প করতে লাগল দুটি বউ। রোজ যেমন করে।

সৌম্য ফিরে এল। চোখ পড়ল নিজেদেব উঠনে। তাবপর ছড়িয়ে গেল সর্বত্র। দৃষ্টির রহস্যই হয়তো এই।

এই বাড়ি সৌম্যর বাবা বিনয়বাবুব। বেশ বড বাড়ি। কিন্তু এত বড বাড়িতে—বিনয়বাবু, বিভাময়ী এবং সৌম্য—মাত্র তিনজন মানুষের বাস কবার যেটুকু সাড়া শব্দ, তা যেন কোনো সাড়া বা শব্দই ছিল না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত নিঃসঙ্গতায় ভবা এক অসীম নির্জনতা যেন থমথম করত সব সময়। চৈত্র কী বৈশাখে, দুপুবের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুবে গা পুড়িয়ে কঠিন কর্কশ স্বরে যখন কাক ডাকত, এঁটো ভাতের দানাগুলো ছড়িয়ে থাকত উঠনেব কোণে; সেইসব মুহূর্তে বাড়িটাকে পোড়ো বাড়ির মতো দুঃসহ মনে হত সৌম্যর।

কিন্তু এইসব অনুভূতিগুলিও এখন সৌম্যর মনে পুরনো। উঠনের মাঝামাঝি পাঁচিল তুলে একটা সুবিধের কাজ সেরে নিয়েছেন বিনয়বাবু। আজ প্রায় দেড মাস হতে চলল পার্টিশনের ওপাশে নতুন ভাড়াটে এসেছে। এই প্রথম।

যাঁরা এসেছেন তাঁরাও বিনয়বাবুর পূর্বপরিচিত। বিনয়বাবুরই অফিসেব সহকর্মী প্রিয়নাথ রায়। বেলেঘাটার যে-বাড়িতে প্রিয়নাথরা ছিলেন, সেখানে নানা অসুবিধে, নিত্য নতুন সমস্যা। মাথার উপর অর্দ্ধেক টিনের ছাদ। জৈষ্ঠ্য মাসের প্রচণ্ড গরমে বাস করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বর্ষায় বৃষ্টির জল ছাদ ফুটো করে মেঝেয় গড়ায়, দেয়াল স্যাঁতসেঁতে। তার ওপর চিমনির ধোঁয়া আছে। বিকেলে আকাশ কালো হয়ে যায়; ঘর অন্ধকার।

কলের জলেব স্বল্পতা। মেয়েদের বাইরে খোলা হাওয়ায় বেরবার সুযোগ নেই। এইসব নানা কারণে পরিবার নিয়ে এই বাড়িতে উঠে এসেছেন প্রিয়নাথ। আর কিছু না হক, পাড়াটা বনেদি। স্কুল কলেজ বাজার সব নাগালের মধ্যে। বেশ ভালো লোক এই প্রিয়নাথবাবু।

এইসব চিন্তার মধ্যেই অনেকটা সময় পালাল। বিকেলের রঙ ক্রমশ তামাটে হয়ে যাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামবে। অন্যমনস্কভাবে সৌম্য ভাবছিল, বিকেলের এই সময়টুকু কি করে কাটানো যায়। এক একজনকে মনে পড়ছিল। জয়ন্তীকে মনে পড়ল। জয়ন্তীর চোখ দুটো সত্যিই ভাবি সুন্দর। অতনুকে মনে পড়ল। তাবপব মলিনাকে। আব--। না, আবার সেই পুরনো চিন্তায় ফিবে যাচ্ছে। এইভাবে সাবাটা বিকেল ফুবিয়ে গেল। এখন গোধূলি। ছোট ছোট মেঘে সিঁদুর ছড়ানো। ভালো লাগছে না, ভালো লাগছে না। তাব চেয়ে ববং বেরনো যাক।

সিঁড়ি গুনে গুনে নিচে নামল সৌম্য। তাবপর পথে পা দিল।

সন্ধ্যে হয়েছে। বাস্তায় ইলেক্‌ট্রিক্ আলোগুলো সব একসঙ্গে জ্বলে উঠল। কে যেন রেডিও খুলল সহসা। আকস্মিকভাবে তীব্র ঝঙ্কারে সেতারের তারগুলো একসঙ্গে বেজে উঠল। তবলাব গর্জনটাও বড় বেশি প্রকট। ভল্যুমটা একটু কমিয়ে দিলেই তো হয়।

পাশ কাটিয়ে ঠুন্ ঠুন্ কবে একটা রিক্‌শা চলে গেল। সহসা মনে পড়ল সৌম্যব, আবো একটু এগিয়ে গেলে বাস্তাব মোড়ে সেই পপুলাব কেবিন। আজকেব এই প্রায় মনোরম সন্ধ্যেটা সেতাবেব ওই তীব্র তীক্ষ্ণ ঝঙ্কারের মতোই কেমন বেসুরো মনে হল সৌম্যব।

জীবনে এমন কিছু কিছু আকস্মিকতা আসে, হঠাৎ আবির্ভাবে যা মনেব সমস্ত সুখ দুঃখ এবং চিন্তাকে এলোমেলো অবিন্যস্ত কবে দিয়ে যায়; এবং সেই ছড়ানো ভাবনাগুলিকে জড়ো কবে নতুন রূপ দেবাব আগেই তা অন্য কোনো চিন্তার সৌরভে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। বিনয়বাবুব বাড়িতে প্রিয়নাথদেব আবির্ভাব যতখানি আকস্মিক; তার চাইতে অনেক বেশি বোধহয় অরুন্ধতীর সঙ্গে সৌম্যর পরিচয়। সহজ সরলতাব মধ্যেও এমন কেউ কেউ আসে,

হৃদয়ের কোন এক অদৃশ্য গহনে যার প্রভাব মনের অগোচরেই শিহর তুলতে থাকে।

প্রিয়নাথবাবুর মেয়ে অরুন্ধতীকে প্রথম যেদিন দেখেছিল সৌম্য, সেদিন থেকেই একটা অদ্ভুত ভাবনা যেন তার বুকের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। দিন, ক্ষণ স্পষ্ট মনে নেই; কিন্তু একটি বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতির স্বাদ এখনো যেন তার শিরা স্নায়ুর সর্বত্র গভীর এক পুলকের মতো জড়িয়ে রয়েছে। সেইদিনই আসবেন প্রিয়নাথবা, জানা ছিল সৌম্যর। জানিয়ে দিয়েছিলেন বিনয়বাবু। কিন্তু কখন, কেমনভাবে আব কোন পরিবেশের মধ্যে যে আসবেন, তা জানত না।

ইউনিভার্সিটি যাবার জন্য তৈরী হয়ে বেরুবাব আগে হঠাৎ বাইরে একটা হাঁক-ডাকের কোলাহল শুনে বেরিয়ে এসেছিল সৌম্য।

বাড়ির সামনেই একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে। দরজা খুলে প্রিয়নাথ বাইরে বেরিয়ে এলেন। আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নামল প্রিয়নাথেব পরিবার,—স্ত্রী, দুটি ছোট ছোট ছেলে, বিধবা দিদি। আর, সকলেব শেষে যে নামল, অপরিচিতা হলেও মুহূর্তেব জন্য সৌম্য ভাবল, এ নিশ্চয় প্রিয়নাথবাবুবই মেয়ে। ভুরু কুঁচকে এবং দৃষ্টিটাকে আরো একটু প্রখব করে মেয়েটিকে দেখল সৌম্য। না, আর কোনো সন্দেহ রাখা চলে না।

সৌম্য দেখছিল, নতুন বাড়িতে এসে ছোট ছেলে দুটিব আত্মহারা আনন্দ, বিধবা দিদির মন-খুতখুত মুখেব হাসি, প্রিয়নাথের স্ত্রীর গলায় আঁচল দিয়ে চৌকাঠ প্রণাম। সকলে নেমে যাবার পব লজ্জা-জড়িত পায়ে মেয়েটি নামল, খুশি-উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বাড়িটার আশপাশ, একতলা, দোতলা। এদিকে তাকাতেই চোখাচোখি হল সৌম্যব সঙ্গে। এক মুহূর্ত দেখেই একটা অপ্রস্তুত লজ্জার ঘোরে চোখ নামিয়ে নিল মেয়েটি। সৌম্য ফিরে এল, যেন একটা স্তব্ধ ঢেউ বুকেব মধ্যে তোলপাড় করছে, ফেনায়িত তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে সবকিছু!

এইভাবে শুরু। অরুন্ধতীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তারপর। প্রিয়নাথ নিজেই ব্যবস্থাটুকু সারতে চেয়েছেন। কিন্তু সবরকম স্বাভাবিকতা ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যেও কোথায় যেন একটা অস্বস্তির কুয়াশা দুর্ভেদ্য আবরণের মতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিসের বাধা কে জানে, মনও জানতে চায় না। তবু, মনের এই এক দোষ! চেতনার কোন এক দুর্গম স্তরে অরুন্ধতী যেন

একটা প্রবল ঝড় তুলেছে ; ভুলে যাবার চেষ্টা করেও বার বার ভুলতে পারছে না সৌম্য !

সৌম্যর চোখে অরুন্ধতীর অস্তিত্বটা এখন তীক্ষ্ণ কোনো আলোর মতন, নিজের ঐশ্বর্যেই যা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ এক নতুন অনুভূতি! এর আগে কেউ কখনো মনকে এমনভাবে চিন্তিত করে নি। পরিচিতা, অর্দ্ধপরিচিতা এবং অপরিচিতা—কেউ না। দেড়মাসের একটা পরিচয়কে আজও পুরনো করতে পারল না সৌম্য। দিনের মধ্যে যখন এবং যতবার দেখছে অরুন্ধতীকে, বার বার যেন এই প্রশ্নটার সঙ্গেই মনে মনে সংগ্রাম করে সৌম্য।

ইউনিভার্সিটি যেতে আজও এই কথাই ভাবছিল।

বাস থেকে যেখানে নামা উচিত, তার অনেক আগেই একটা স্টপে নেমে পড়ল। এখনো কিছুক্ষণ সময় রয়েছে। এই পথটুকু অনায়াসে হেঁটে যাওয়া চলে। এলোমেলো মনটাকে নিয়ে এগিয়ে চলল সৌম্য।

আজ পর্যন্ত অনেক মেয়ের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে সৌম্যর। সে-পরিচয় কোথাও কোথাও ঘনিষ্ঠ আলাপেও পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার বেশি নয়। যতই পরিচিতা হক, একক চিন্তার মধ্যে কেউ কখনো কোনো ছায়াপাত করে নি। সত্যি বলতে কি, মেয়েদের বিশেষ চোখে দেখবার মতো দৃষ্টির মহিমা তার কোনোদিনই ছিল না।

কিন্তু আজকের চিন্তাটা যেন অন্য স্রোতে বইছে। এতদিন মনে একটা বিশ্বাস ছিল, আস্থা ছিল নিজের ওপর। কিন্তু, আজ। যেন একটা নিষ্ঠুর আঘাত হেনে সেই উদাসীন আত্মবিশ্বাসের জোরটা কেউ ভেঙে দিয়েছে! ভাবনার মধ্যে আর কোনো খেই খুঁজে পাচ্ছে না সৌম্য। সব যেন ভেসে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে কোথায়! বার বার অরুন্ধতীর সেই শ্যামল, লজ্জারুন মুখটি মনে পড়ছে। আয়ত চোখে আর কমনীয় মুখে যেন বনশ্রীর স্নিগ্ধ সুষমা! মনে পড়ছে জয়ন্তীকে।

যেতে যেতেই আত্ম দংশনে ছটফট করে সৌম্য। ছি, এসব কি ভাবছে সে। চোখের উপরের একটা অদৃশ্য পর্দা কি আজ সরে গেল!

সামনে সেনেট হল্। দ্রুত হেঁটে ইউনিভার্সিটি কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়ল সৌম্য। তারপর এগিয়ে গেল।

মেয়েদের কমনরুমের কাছে দাঁড়িয়ে আরো দু-তিনটি মেয়ের সঙ্গে গল্প

কাঁদছিল মলিনা। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই দেখতে পেল সৌম্য। মনটা আজ সত্যিই বড় অসহায় আর দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে মলিনার সঙ্গে দেখা না হলেই বুঝি ভালো হত।

সৌম্য ভেবেছিল পাশ কাটাবে। কিন্তু ততক্ষণে মলিনাও তাকে দেখতে পেয়েছে। হাসতে হাসতে এগিয়ে এল।

—কি ব্যাপার! আজ যেন তোমাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

বিব্রত স্বরে সৌম্য বলল, কই, না!

মলিনা বলল, নিশ্চয় কিছু হয়েছে।

সৌম্য হেসে বলল, স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। বাদ-প্রতিবাদে অনেকদূর গড়িয়ে যাবে। আমার আবার ক্লাশ আছে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক-পলক সৌম্যকে দেখল মলিনা। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আগামী পরশু দিনের কথা তোমার মনে আছে তো? কম্পিটিশন্ ডিবেট!

অন্যমনস্কভাবে সৌম্য বলল, তা আছে। তর্ক-বিতর্কের কথা কে আর ভোলে! তার ওপর প্রতিযোগিতা যখন!

মলিনা একটু গম্ভীর হল।—না, সৌম্য, অত সহজভাবে কথা বলো না। একটু সিরিয়াস্ হও। আর কেউ হলে দুঃখ ছিল না। কিন্তু তুমি যদি না পার তাহলে মলিনার চেয়ে বেশি হতাশ আর কেউ হবে না।

সেই মুহূর্তে কোনো জবাব দিল না সৌম্য। চোখ ছোট করে ও তখন দেয়ালের গায়ে পোস্টারটা দেখছিল। আজ শনিবার। পরশু সোমবার। প্রতিযোগিতা নিয়ে এর মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এখানে ওখানে আলোচনা জমে উঠেছে। একটু কাঁপল সৌম্য। নীচু মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল মলিনা। সৌম্য জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি মনে হয়, মলি, আমি পারব না?

—তুমি পারবে না, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। তোমাকে তো জানি, তাই তোমার ওপর অনায়াসে বিশ্বাস করি, নির্ভরও করি। কিন্তু, আরো একজনের নাম ক-দিন থেকে শুনতে পাচ্ছি। পলিটিক্সের অমর্ত্য চক্রবর্তীকে চেন?

—চিনি বোধ হয়।

—অমর্ত্য নাকি খুব ভালো প্রিপারেশন্ করেছে। বলেও ভালো। দেখে শুনে তো আমারও তাই মনে হল।

—তোমার সঙ্গে আলাপ আছে নাকি ? রিস্টওয়াচে সময় দেখল সৌম্য।

মলিনা বলল, ছিল না। নতুন হয়েছে। আমার বন্ধু মীরা চক্রবর্তীর কি রকম ভাই হয়। সে-ই পরিচয় করিয়ে দিল।

সৌম্য একটু হাসল।

মলিনা বলল, অমর্ত্য দেখলুম শোপেনহাওয়ারকে একেবারে গুলে খেয়েছে। রাসেল্ তো মুখস্থ।

—শুনে আনন্দ হল। আর তো দুটো দিন। তার পরেই বোঝা যাবে। যাবার জন্য ব্যস্ত হল সৌম্য।

পাশে পাশে কয়েক পা এগিয়ে এল মলিনা।

—বাজে কথায় কান দিয়ে আসল কাজের কথাটাই যেন ভুলে যেও না। পরশু আমাদের বাড়ি যাওয়ার কথা, মনে আছে তো ? ছ মাস থেকে বলে বলেও তোমার সময় করাতে পারি নি।

সৌম্য বলল, সেজন্য আমি লজ্জিত। আরো একবার ক্ষমা চাইছি। সোমবার নিশ্চয় যাব। ডিবেট তো শেষ হবে পাঁচটায়। তারপর কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে বল, আমি অপেক্ষা করব।

ভ্রূভঙ্গী করে মলিনা বলল, তোমাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না। তখন তোমার মনে থাকবে কিনা সন্দেহ! যাই হক, আমিই বরং অপেক্ষা করব, তুমি সোজা চলে এস। আমি মেডিক্যাল কলেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকব।

সৌম্য একটু অবাক হল। —অত দূরে!

অস্ফুট স্বরে মলিনা বলল, একটু দূরই ভালো। এস কিন্তু।

সৌম্য বলল, আসব।

মলিনা পিছিয়ে পড়ল। এইমাত্র একটা ক্লাশ শেষ হয়েছে। সিঁড়ি, বারান্দা আবার কোলাহলে, হাসিতে, পায়ের শব্দে মুখর। যেতে যেতে অকারণেই একবার পিছনে তাকাল সৌম্য। মলিনাকে আর দেখা যাচ্ছে না, খুব সম্ভব আবার কমনরুমে ঢুকেছে। সৌম্য আর দাঁড়াল না। বারেকের জন্য ভাবল, মলিনা বোধ হয় আজকাল সৌন্দর্যের দিকে নজর দিচ্ছে। মুখের রঙ আগের চাইতে পরিষ্কার, মসৃণ গাল ও চিবুক, চোখে মিহি কাজল! আজ ওকে খুব খারাপ লাগে নি! ভাবতে ভাবতে ক্লাশে ঢুকে পড়ল সৌম্য।

শান্ত হয়ে গেছে ইউনিভার্সিটি পাড়ার কোলাহল। কলেজ স্ট্রীটের জনস্রোতে এখন ভাটার টান। চৈত্রের ঝড়ো বাতাসের মতো অস্থির হয়ে ছুটাছুটি করছে সব। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। অন্ধকার হয়ে এল।

পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়াল সৌম্য। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। সাড়ে পাঁচটার বুড়ি ছুঁয়ে ঘড়ির কাঁটা দ্রুত ছটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, মলিনা এখনো এল না। কথা ছিল, সে-ই এখানে এসে অপেক্ষা করবে। ছটফটে চোখে এদিক ওদিক তাকাল সৌম্য।

মনের ভিতর একটা অসহিষ্ণু জ্বালা ছটফট করছিল। মলিনার আশঙ্কাটা যে বাস্তবেও সত্যি হয়ে দেখা দেবে, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সৌম্য তা বুঝতে পারে নি। অথচ, অমর্ত্যই জিতে গেল শেষ পর্যন্ত! সেই পরাজয়ের জ্বালা, বেদনা এবং দুঃখ, অনুতাপ তীব্র বিষের মতো এখন একটু একটু করে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল সৌম্যর সর্বাঙ্গে। কে জানে, এই গ্লানি মলিনাকেও স্পর্শ করেছে কিনা! ছটা বাজতে আর মাত্র তেরো মিনিট। এখনো এল না মলিনা! শেষ পর্য্যন্ত ভুলে যায় নি তো!

সহসা একটা বিকট শব্দে চমকে উঠল সৌম্য। ঢং ঢং শব্দে পাগলা ঘণ্টি বাজিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের দুটো গাড়ি মীর্জাপুর স্ট্রীট ধরে সোজা ছুটে গেল চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর দিকে।

আর দাঁড়ানো যায় না। প্রায় এক ঘণ্টা একভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে পায়ের গিঁটগুলো সব অবসন্ন হয়ে ভেঙে পড়তে চাইছে। অস্বস্তিতে মাথাটা ভারি ভারি; গলার ভিতরটা শুকিয়ে জ্বালা করছে। মলিনা বোধ হয় আর আসবে না। হতাশ হয়ে পা বাড়াল সৌম্য।

দু পা যেতে না যেতেই আবার থেমে পড়তে হল। না, মলিনা নয়।

সমরেশ জিজ্ঞাসা করল, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলি?

সৌম্য অন্যমনস্ক। বলল, একজনের আসবার কথা ছিল। অপেক্ষা করছিলাম।

—ও। সমরেশ চুপ করে গেল। আঙুলের ফাঁকে জ্বলা সিগারেট থেকে একটা পোড়া পোড়া গন্ধ উঠছে। চুলগুলো রুক্ষ, এলোমেলো।

গলার ভিতরটা থুথু দিয়ে একবার ভিজিয়ে নিল সৌম্য।

সমরেশ বলল, তোর জন্যে দুঃখ হয়, সৌম্য। শুধু একটা পার্সিয়ালিটির জোরে তোকে হারিয়ে দিল। what a nonsense!

—ও-কথা বলে কোনো লাভ নেই। ম্লান হাসল সৌম্য। —অমর্ত্য সত্যিই খেটেছিল। ও যে পাবে, এতে আশ্চর্য হবাব কিছু নেই।

চোখ বুজে সিগাবেটে টান দিয়ে উর্দ্ধমুখে ধোঁয়া ছাড়ল সমরেশ। —অমর্ত্য চক্রবর্তী আজ পার্টি দিচ্ছে। দলটাও বেশ ভারি হয়েছে দেখলাম।

—মন্দ কী। দশজনকে নিয়ে যদি আনন্দ কবতে পারে, সেইটেই তো সবচেয়ে ভালো।

—Damn it? সৌম্যব কাঁধে একটু চাপ দিল সমরেশ। —You are what you are!

সৌম্য হাসল।

সমরেশ বলল, চলি।

একটু ইতস্তত কবে সৌম্য জিজ্ঞাসা কবল, মলিনাকে দেখেছিস নাকি?

সমরেশ ভ্রূকুঞ্চিত কবল। —So, you are waiting for her! A pity indeed! Hear me, she too is with Amorto, the winner

মেডিক্যাল কলেজেব গেট দিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স্ বেবিয়ে এল। ট্রাফিক পুলিশ হাত দেখিয়েছে। পথ বন্ধ। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল সৌম্য।

সমবেশ বলল, সিগাবেট খাবি?

—না।

—That's good তুই এবাব বাড়ি যা। অনেক সময় নষ্ট করেছিস।

শান্ত করুণাব একটা ভাব নিয়ে চলে গেল সমবেশ।

সত্যিই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এতক্ষণে বুঝল সৌম্য। মলিনা আসবে না, তা আগেই বোঝা উচিত ছিল।

জোর জোর পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল সৌম্য। আব কোথাও দাঁড়ানো নয়, কারুর জন্য অপেক্ষা করাও নয়। সোজা বাড়ি। পকেট থেকে রুমাল

[illegible] মুখর [illegible]। তারপর ভীড় ও [illegible] বাসের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

মেঘ করেছে আকাশে। বঙ্গোপসাগরে বৃষ্টি ঝরিয়ে শহরের দিকে ছুটে আসছে মেঘ। কালো, সাদা-সাদা কালো, ছাইরঙ। যে কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। কিন্তু কারো সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিকেলের জনতার স্রোত আবার চঞ্চল, শব্দময়। মীর্জাপুর স্ট্রীটের ফুটপাথে হকারদের আবুহোসেনি রাজত্ব। ভিড় বাড়ছে ক্রমশ।

পর পব তিনটে ডাউন বাস চলে গেল। আপের গাড়ি একটাও এল না। সময় বুঝে সবাই যেন বিদ্রূপ শুরু করেছে।

কিন্তু বাস না এলেও আর কেউ এল। সে-আসাও নিতান্ত আকস্মিক বলা যায়।

সৌম্য দেখল কলেজ স্কোয়াবের ফুটপাত ধবে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে জয়ন্তী। হঠাৎ সৌম্যকে দেখে রাস্তা পাব হয়ে এগিয়ে এল।

—আরে, আপনি! প্রায় অনিচ্ছায় বলল সৌম্য।

সবল রেখায় হাসল জয়ন্তী। থমথমে মেঘের রহস্য-ভরা এই সন্ধ্যাব পরিবেশে জয়ন্তীর ওই প্রসাধনহীন সর্বশুক্লা সাজ ভাবি সুন্দর মানিয়েছে যেন। মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইল সৌম্য।

শাড়ির আঁচলটিকে কাঁধের উপর গুছিয়ে নিয়ে জয়ন্তী বলল, দূর থেকে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবলাম কন্‌গ্র্যাচুলেশন জানিয়ে আসি।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সৌম্য, কন্‌গ্র্যাচুলেশন।

—হ্যাঁ, আপনাব বলা সত্যি অপূর্ব লেগেছে।

সর্বাঙ্গে একটা বিষাক্ত দংশনের জ্বালা অনুভব কবল সৌম্য। স্পষ্ট গলায় বললে, ঠাট্টা করছেন।

জয়ন্তী বললে, না। আমি জানি আপনাব হার হয়েছে। কিন্তু হাব-জিতের প্রশ্নই তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নয়। আপনার বলা যদি ভালো লেগে থাকে, তার জন্য স্তুতি জানানোর অধিকার কি আমার নেই!

নীরবে হাসল সৌম্য।

জয়ন্তী বলল, পরাজয়ের বেদনা না থাকলে জয়ের আনন্দ পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় না; এ-সত্যটা সব সময় মনে রাখবেন। হয়তো আজকের এই পরাজয়ই ভবিষ্যতে আপনাকে আরো অনেক জয়ের পথ দেখিয়ে দেবে।

[illegible]
জবাব তৈরি করে নিল। এই যে একজন সহজ অকারণে [illegible] সর্বস্বান্ত হল; আর কিছু না হক, খানিকটা দুর্বল চিন্তার ঝড় এই সময় মনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এই ধরনের অনুভূতিগুলোকে ভাষায় কি করে বা কোনরূপে প্রকাশ করলে সঠিক মর্ম বোঝানো যায়, সৌম্য তা জানে না। হৃদয়ের তারে তারে যে-সূক্ষ্ম বেদনার সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে অব্যক্ত জ্বালায় গুমরে মরে; প্রচণ্ড মনে হলেও আসলে তার ধ্বনি এত নিঃশব্দ যে, হৃদয়ের মধ্যেই তা সুরের কাঁপন ভুলে স্তব্ধ হয়ে যায়। ঠিক কান্না নয়, হাসিও নয়, মনের আয়নায় তার স্পষ্ট রূপটিও প্রতিফলিত হয় না। সেই বিশেষ মুহূর্তে মনের চিন্তাগুলি সব হারিয়ে যা চায়, তা হল একটু নিশ্চিন্ত নির্ভয় আশ্বাস, অবলম্বনের নিকটতম আশ্রয়! এই মুহূর্তে সৌম্যর মনে হল, আলোয় উজ্জ্বল কলকাতা শহরের জনাকীর্ণ পথে দাঁড়িয়ে তার চেয়ে নির্জন বুঝি আর কেউ নেই। কেমন এক ধবনেব দুর্বোধ্য যন্ত্রণা যেন নিশ্বাসে হাঁফ ধরিয়ে দিচ্ছে!

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকাল সৌম্য। মাথাব চুল থেকে পায়েব আঙুল পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজল। এমন নিখুঁত দৃষ্টিতে, এমন পবিপূর্ণ বিস্ময়ে আজ পর্যন্ত কোনো মেয়েব দিকে তাকিয়েছে কিনা সন্দেহ। যেন বিন্দু বিন্দু কোমলতা দিয়ে তৈরী হয়েছে জয়ন্তীর ওই শুভ্রা সুন্দব শবীর! স্নিগ্ধ, সুন্দর ও পবিত্র! সৌম্য মুগ্ধ হয়ে গেল।

জয়ন্তী জিজ্ঞাসা কবল, কী ভাবছেন?

সৌম্য সাড়া দিল না। শুধু অনেকক্ষণ পরে মন্ত্রোচ্চারণেব মতো নিঃশব্দে ডাকল, জয়ন্তী।

জয়ন্তী একটু কাঁপল। কিছু বলল কিনা, বোঝা গেল না।

হঠাৎ হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ফুটপাতের ওপর চিনেবাদামওয়ালার গ্যাসলাইটের শিখাটা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভীষণভাবে যুদ্ধ কবতে লাগল। লকলকিয়ে বিদ্যুৎ চমকে গেল আকাশে।

সহজ হয়ে সৌম্য একটু হাসল।

উতরোল হাওয়ায় সৌম্যর মাথার চুলগুলি বার বার কপালের উপব উড়ে এসে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। জয়ন্তীর ইচ্ছে করছিল, সৌম্যর

ওই চুলগুলি নিজের হাতে পরিপাটি করে দেয়। ইচ্ছেটা যেন কুমারী-লজ্জায় [illegible] হয়ে মুখ নিচু করে।

[illegible] যেন।

[illegible] এখনো বাড়ি ফেরেন নি তো?

[illegible] বলল, কই আর ফিরলাম! অজিনার জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই [illegible] হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা।

—তা হলে এখনো কিছু খাওয়া হয় নি বলুন! খুব ছেলে আপনি!

জয়ন্তীর কথায় সাড়া না দিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে জয়ন্তীর সামনে থেকে একেবারে পাশে সরে দাঁড়াল সৌম্য। পায়ে-হাঁটা লোকজন হঠাৎ এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করেছে। একটা কুকুর ছুটে গেল পাশ দিয়ে।

—একী, বৃষ্টি শুরু হল যে! সৌম্য বলল।

বেশ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমেছে। জয়ন্তীর মুখে এক ঝলক আলো ছুঁড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ কেঁপে গেল।

শূন্য ফুটপাতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সৌম্য বলল, আপনি ভিজছেন যে!

—আপনিই বুঝি শুকনো রয়েছেন? চপল হেসে জয়ন্তী বলল।

সেই বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যেই প্রায় বিহ্বল দুজনে ছুটতে ছুটতে কোথায় দাঁড়াবে বুঝতে পারল না। দু-একটা যা আশ্রয় ছিল, এতক্ষণে তা ভরে উঠেছে। শ্যামবাজারের দিক থেকে একটা ডবলডেকার চাকায় জল ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ এসে থামল। কী করবে বুঝতে না পেরে সৌম্য বলল, তাড়াতাড়ি চলুন, ওই বাসটাতেই ওঠা যাক।

শাড়িব আঁচল বাঁচাতে বাঁচাতে জয়ন্তী বলল, তাই চলুন।

বাসে অনেক 'সিট' খালি ছিল। পাশাপাশি বসল দুজনে। কিন্তু প্রথম দিকে দু-একটা অতি সাধারণ কথা ছাড়া সারাটা পথ কেউ আর কোনো কথা বলল না। কাচের জানলার ওপাশে বৃষ্টি-পড়ার ঝাপসা জগতটার দিকে তাকিয়ে থাকল শুধু।

এসপ্ল্যানেডের কাছে এসে মনে হল বৃষ্টিটা যেন একটু কমেছে। সৌম্য বলল, চলুন, এইখানেই নেমে পড়ি।

বলেই উঠে দাঁড়াল সৌম্য। নিঃশব্দে অনুসরণ করল জয়ন্তী।

বৃষ্টির রোষ এখন অনেকটা শান্ত। জুঁইফুলের মতো ঝিরঝির নিঃশব্দে যা ঝরছে, তাও নেহাত সামান্য। রাস্তায় স্বাভাবিক লোক চলাচল।

বৃষ্টির জলে ধুয়ে গড়ের মাঠের আলোকসজ্জাকে মনে হচ্ছে আশ্চর্য মনোরম।

[illegible] সৌম্য [illegible] আমাদের দেখে কেউ কেউ কি ভাবতে পারে জানেন?

ঘাড় ঘুরিয়ে জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করল, কি?

—ভাববে, আমি বুঝি আপনাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কোথাও।

অধরপ্রান্তে ম্লান অথচ স্নিগ্ধ, এবং প্রসন্ন বেদনায় করুণ একধরনের হাসি ফুটিয়ে জয়ন্তী বলল, মোটেই না। জোর করে বাহাদুরির বোঝাটা নিজের ঘাড়ে চাপাবেন না; সহ্য হবে না। আর, সত্যিই যদি তা পারতেন, তাহলে—

একটু থেমে, যেন একটু শ্বাস টেনে জয়ন্তী বলল, কিন্তু, আমরা কোথায় যাচ্ছি, বলুন তো।

থেমে দাঁড়িয়ে সৌম্য বলল, তাই তো!

অল্প হাসল জয়ন্তী। তারপর কি ভেবে বলল, বরং চলুন, ওই রেষ্টুরেণ্টটায় ঢোকা যাক। আপনি কিছু খেয়ে নেবেন।

ক্ষুব্ধ স্বরে সৌম্য বলল, না, এ আপনার অন্যায়। এমন জানলে আপনার সঙ্গ ধরতুম না।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে জয়ন্তী বলল, কিন্তু সত্যিই তো আপনার খিদে পেয়েছে!

সৌম্য বলল, সেটা প্রকাশ্য ঘোষণার কথা নয়। বাড়ি গিয়ে খেলেই চলত।

তীক্ষ্ণ চোখে সৌম্যর মুখের দিকে তাকিয়ে এক পলক কি খুঁজল জয়ন্তী। তারপর মুখ নিচু করল।

জয়ন্তীর চোখের এই অস্বাভাবিক কারুণ্য এর আগে কখনো লক্ষ্য করে নি সৌম্য। এক মুহূর্ত জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে বলল, আচ্ছা, চলুন।

গ্র্যাণ্ড্ হোটেলের নিচে একটা রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে 'মহিলা' নির্দিষ্ট একটি ছোট্ট কেবিনের নিভৃত কোণে মুখোমুখি বসল দুজনে।

প্রায় সমবয়সী একটি কুমারীর সম্মুখে বসে নিশ্চিন্ত মনে খাওয়ার চেয়ে বিড়ম্বনা আর কিছুতে আছে কিনা, এই মুহূর্তে সৌম্যর তা মনে পড়ল না। শুধু তীক্ষ্ণ মুখ একটা অস্বস্তিতে চেয়ারে বসে ছটফট করতে লাগল।

তবু সমস্ত অস্বস্তির সঙ্কোচ সান্নিধ্যের স্পর্শে কাটিয়ে দেওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য নিয়েই যেন জয়ন্তীর আবির্ভাব! সৌম্যর মনে হল, দুদিনের না; [illegible] জয়ন্তী [illegible] বহুদিনের পরিচিতা; পুরনো [illegible] [illegible]

[illegible] । সেই সবে টুকরো টুকরো কথা।

—আমার তো সবই শুনলেন, সৌম্য বলল, এবার আপনার কথা বলুন।

একটু হেসে জয়ন্তী বলল, বলবার মতন কিছুই নেই আমার।

—ঠাট্টা করছেন?

শুনতে সেইরকমই লাগে অবশ্য। কিন্তু, কথাটা সত্যি। আমার ভয় হয়, সব কথা শুনে হয়তো আপনার ভালো লাগবে না।

সৌম্য বলল, আপত্তি থাকলে আমি জোর করব না।

সেই মুহূর্তে কোনো সাড়া দিল না জয়ন্তী। নীরবে বসে থাকল কিছুক্ষণ। জয়ন্তীর মুখটাকে সহসা বড় বেশি অসহায়, করুণ এবং উদাস, বিষণ্ণ মনে হল সৌম্যর।

এরপর জয়ন্তী তার কাহিনী বলে গেল।

জয়ন্তীর তিন বছর বয়সে হঠাৎ আত্মহত্যা করে তার মা একদিন মারা গেলেন। কোন দুঃখে বা কোন যন্ত্রণায় মা এমন করলেন, কেউ তা জানল না। তিন বছরের জয়ন্তী তারপর বাবার সঙ্গে কলকাতায় চলে এসেছিল। কিন্তু, এইখানেই সমস্ত ঘটনার শেষ হয় নি। কারণ, আরো মাত্র তিনটে বছর ফুরতে না ফুরতেই জয়ন্তীর ভাগ্যটাকে নতুন করে চমকে দিয়ে তার বাবা আবার বিয়ে করলেন; এবং সস্ত্রীক বর্মায় চলে গেলেন। জয়ন্তী রইল তার বিপত্নীক, নিঃসন্তান মামার কাছে, কলকাতায়। এবং সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সেই মামার অফুরন্ত স্নেহের সার সংগ্রহ করেই দিনের পর দিন ফুটে উঠেছে জয়ন্তী। ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে।

বিদেশে গিয়ে বাবা আর কোনো খোঁজ খবর নিতেন না। আরো কয়েক বছর পরে তাঁর মৃত্যু সংবাদ এখানে এসে পৌঁছল। সেদিন মনে মনে একটা স্বস্তির হাঁফ ছেড়েছে জয়ন্তী। যেটুকু স্নেহের অভাব কাঁটার মতন বুকে বিঁধত, এতদিনে তা নিজেই তার পথ থেকে সরে গেল। ভালোই হল। আর কোনো জ্বালা নেই, আক্ষেপ নেই। তবু, অবচেতন মনের কোনো এক স্তরে

অতীতের একটা ক্ষত-চিহ্ন এখনো গভীর। তার ছায়া কখনো কখনো চোখের তারায় ফুটে ওঠে।

জয়ন্তী সেনের জীবনের ইতিহাস তো এইটুকুই।

সংক্ষেপে বলে বিষণ্ণ হাসল জয়ন্তী। তারপর মুখ নিচু করে কি ভাবতে লাগল।

সৌম্য বলল, এই বরং ভালো, জয়ন্তী। কোনো বাধা নেই, বাঁধন নেই। বেশ নিরিবিলি, নিঃসঙ্গ, নিজস্ব জীবন!

ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল জয়ন্তী। তারপর সহসা চঞ্চল হয়ে বলল, চলুন, উঠি এবার। রাত হল বেশ। এবার বাড়ি না ফিরলে মামা খুব ভাববেন। আপনাকেও আবার—

—হ্যাঁ, আমাকেও বাড়ি ফিরতে হবে। অবশ্য খাওয়ার চিন্তাটা আজকের মতো একেবারে নিশ্চিন্ত। উঠে দাঁড়িয়ে সৌম্য বলল।

রেষ্টুরেণ্টের বাইরে এসে জয়ন্তী বলল, খুব রাত কিন্তু হয় নি এখনো। মাত্র সাড়ে আটটা।

অনেকক্ষণ মেলামেশা আলাপ আলোচনার পর আজকের মতন বিচ্ছেদ আসন্ন ভেবে মনটা কেমন থমথম করছে। সিরসিরে একটা আনন্দ যেন একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে সর্বাঙ্গে। জয়ন্তী যেন তার মনটাকে সমস্ত গ্লানির জ্বালা ভুলিয়ে দিয়ে উৎসবের পতাকার মতন বাতাসে মেলে দিয়েছে! ক্লান্ত, অবসন্ন দৃষ্টি তুলে জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকাল সৌম্য।

অল্প হেসে প্রশ্ন করল জয়ন্তী, কী ভাবছেন?

—কিছু না। বাড়ি ফেরা যাক এবার। নেহাত অনিচ্ছায় কথাগুলি বাতাসে ছড়িয়ে দিল সৌম্য।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অনুনয়ের স্বরে জয়ন্তী বলল, একটা কথা বলব? অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে!

—সে পাট তো অনেক আগেই আপনি তুলেই দিয়েছেন।

—তা সত্যি। মৃদু হেসে জয়ন্তী বলল, চলুন না আমাদের বাড়ি, মামার সঙ্গে আলাপ করে আসবেন। রাত তো খুব বেশি হয় নি এখনো?

সৌম্য একটু হাসল। ইচ্ছে করলেই জয়ন্তীর অনুরোধটাকে প্রত্যাখ্যান করা চলে। কিন্তু, এ কি শুধুই বন্ধুত্বের অনুরোধ! অদ্ভুত এক অনুভবের মোহে জয়ন্তী যেন তাকে আকর্ষণ করছে! মনের দিক থেকে কোনো জোর

পেল না সৌম্য। আস্তে আস্তে বলল, বেশ চলুন। কিন্তু, একটা শর্ত। বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবেন না।

জয়ন্তী বলল, ধরে রাখবার মত অধিকার কি আমার আছে!

জয়ন্তীর গলা কাঁপল। সৌম্য কিছু বলল না।

ক্যামাক স্ট্রীটে জয়ন্তীদের বাড়ির সম্মুখে ট্যাক্সি থেকে নেমে সৌম্য একটু অবাক হল। বাড়ি বললে ভুল হয়। বরং প্রাসাদ। কোথাও এতটুকু মালিন্যের চিহ্ন নেই; বাড়াবাড়ি করে দ্রষ্টব্য হওয়ার চেষ্টাও নেই। পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্যে ঝকঝকে একটা নির্জন দ্বীপের মতন নিস্তব্ধ ও সুন্দর! সৌম্যর ভালো লাগল।

ফটকের বাইরে দেওয়ালের গায়ে শ্বেতপাথরে লেখা একটি নাম: রায়বাহাদুর শঙ্কর নারায়ণ রায়। লুকনো আলোর শেড্ থেকে কতকগুলি আলোর রেখা ওই নামের উপর ছড়িয়ে পড়ে নামটিকে যেন আরো মহিম করে তুলেছে!

জয়ন্তী ডাকল, আসুন।

একতলার অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় একটি সুন্দরভাবে সাজানো ঘরে সৌম্যকে নিয়ে গেল জয়ন্তী।

দরজার দিকে পিছন ফিরে সোফায় বসে যিনি বইয়ের পাতায় দৃষ্টি ডুবিয়ে আছেন, কেউ বলে না দিলেও, তিনিই যে রায়বাহাদুর শঙ্কর নারায়ণ রায়, তা বুঝতে দেরি হয় না সৌম্যর। রায়বাহাদুরের ঋজু দেহ ও বসার ভঙ্গীই তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

রায়বাহাদুরের মগ্নতা ভেঙে তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল জয়ন্তী। চমকে উঠে রায়বাহাদুর বললেন, এতো দেরি করলে মা! আমি ভাবছিলুম, কোথায় গেল মেয়েটা!

রায়বাহাদুরের কথার কোনো জবাব না দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জয়ন্তী বলল, দেখ, বাপি, কে এসেছে।

এই সম্বোধনটা জয়ন্তীর পুরনো অভ্যাস।

জয়ন্তীর কথায় ফিরে তাকালেন রায়বাহাদুর, এবং সৌম্যর মুখের উপর দৃষ্টি ফেলে অস্ফুট বিস্ময়ে বললেন, Yes, quite a newcomer! কে জয়ন্তী!

জয়ন্তী বলল, আমার ক্লাশফ্রেণ্ড, সৌমিত্র বসু। ওর নাম তুমি শুনেছ, বাপি ; সেই যে সেবার ছবি দেখেছিলে কাগজে। সৌম্য ইংরাজী অনার্সে ফার্স্ট হয়েছিল।

—I see! সোফা ছেড়ে উঠে এসে সৌম্যর সম্মুখে দাঁড়ালেন রায়বাহাদুর।—Much pleased to see you, my child! কিন্তু, জয়ন্তী, সৌম্যকে তো এর আগে কখনো দেখি নি!

জয়ন্তী বলল, আজকেও নেহাত পথ ভুলে এসে পড়েছে। ও যা ছেলে!

হো হো করে হেসে উঠলেন রায়বাহাদুর।—বাহাদুরিটা তাহলে জয়ন্তী মায়ের, কি বল, সৌম্য! বেশ, মাঝে মাঝে এস। আসবে তো!

সৌম্য মাথা নাড়ল।

রায়বাহাদুর বললেন, জয়ন্তী, তোমার বন্ধুকে নিয়ে যাও। হ্যাঁ, মোহনলালকে বলো যাবার সময় যেন গাড়ি বের করে পৌঁছে দিয়ে আসে।

জয়ন্তী ডাকল, আসুন।

রায়বাহাদুরেব সান্নিধ্য থেকে চলে এলেও মনটা কিন্তু রায়বাহাদুরের তীব্র ব্যক্তিত্বের স্পর্শে মধুর ও মুগ্ধ হয়ে যায়। ওই বিরাট ব্যক্তিত্বের আড়ালে গভীব হৃদয়েব যে-স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তীর্ণ, তার পবিধি খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এই বাড়ির প্রতিটি ঘর, বারান্দা আর ছাদ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল জয়ন্তী। তারপব নিজের ঘবে নিয়ে গিয়ে বসাল।

কথার কথকতায় কোথা দিয়ে অনেকক্ষণ সময় কেটে গিয়েছে!

ফিরে আসবার সময় জয়ন্তী বলল, দাঁড়ান, ড্রাইভারকে গাড়ি বার কবতে বলি। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

—না, জয়ন্তী। গম্ভীর গলায় সৌম্য বলল, এ অনুরোধটা অমান্য করতে দিলেই খুশি হব। রাত তো বেশি হয় নি ; বাসে চড়ে দিব্যি যাওয়া যাবে।

—আমার অনুরোধ না হয় না শুনলেন। কিন্তু বাপির কথা না শুনলে রাগ করবেন।

সৌম্য বলল, শুরু থেকেই আজ আপনার কাছে হেরে যাচ্ছি।

জয়ন্তী বলল, আপনাকে হারিয়ে নিজেই কি জয়ী হতে পেরেছি! আমি যে অনেক আগেই হেরে বসে আছি।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে বারান্দার সম্মুখে দাঁড় করাল ড্রাইভার। হঠাৎ ভীষণ সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল সৌম্য।

কিন্তু এ-সঙ্কোচও নেহাত তুচ্ছ একটা অসার ইচ্ছে মাত্র! অগত্যা উঠে বসতে হল।

সৌম্য বলল, চলি।

জয়ন্তী হাসল। —অনেক কষ্ট দিলাম কিন্তু।

সৌম্য হেসে বলল, মনে থাকবে।

গাড়ি স্টার্ট হল। বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে জয়ন্তী। ফটক পার হতেও আর বেশি দেরি নেই স্টুডিবেকারের।

ব্যস্ত আকুলতায় সহসা চেঁচিয়ে ওঠে জয়ন্তী, মোহনলাল, দাঁড়াও!

শুনতে পেয়েছে মোহনলাল। আর ফটকের একেবারে মুখের কাছে এসেই থেমে গিয়েছে গাড়িটা।

ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসে জয়ন্তী।

সৌম্য প্রশ্ন করে, কী হল?

কম্পিত স্বরে জয়ন্তী বলে, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গিয়েছি।

—কী?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ম্লান গলায় জয়ন্তী বলে, পরশু আমরা চলে যাচ্ছি।

—কোথায়।

—নৈনিতাল।

—কেন!

—এমনি। বাপি বেড়াতে যাচ্ছেন, তাই আমাকেও যেতে হবে। যেন একটা গভীর আবেগ উথলে উঠছে জয়ন্তীর কণ্ঠ দিয়ে।—আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু…

সৌম্যর মুখের দিকে তাকিয়েই চুপ করে যায় জয়ন্তী।

—আবার কবে ফিরবেন? সৌম্য জিজ্ঞাসা করে।

জয়ন্তী বলে, পনরো দিন পরে।

জোর করে হাসতে চেষ্টা করে সৌম্য।—আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

জয়ন্তীর কথার সাড়া না শুনেই স্টার্ট হয়ে গেল স্টুডিবেকার। জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে পলকের জন্য জয়ন্তীর শুভ্র, সুন্দর ও নিশ্চল দেহটা দেখতে পেল সৌম্য। তারপর আর কিছুই চোখে পড়ল না।

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হল।

উঠনে বিভাময়ী দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাশে অরুন্ধতী।

সৌম্য একটা হোঁচট খেল। অদৃশ্য এক মায়ার শাসনে অরুন্ধতী যেন সবসময় তার মাথাটাকে নিচু করে দেবার মতলব করেছে! অসহ্য! সৌম্যর ঠোঁট কাঁপছিল।

কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ছটফট করতে করতে পার্টিশনের দরজার দিকে ছুটে গেল অরুন্ধতী।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম এল না সৌম্যর। বিছানাটা যেন আগুন! আরো অনেকক্ষণ পরে খোলা জানলা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এল ঘরে।

অনেক দিন পরের কথা ভাবছিল সৌম্য।

এইভাবে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। সকাল থেকে সন্ধ্যে এবং রাত্রি—সারাটা সময় যেন দুঃসহ অস্বস্তির বিষণ্ণ যন্ত্রণায় ভরা। সকালে প্রশস্ত লনে রৌদ্র ছায়ায় শালিক চড়ুইয়ের দল নেমে আসে। বিকেলে গুল্মোরের ডালে হাওয়াব মাতামাতি। সন্ধ্যাটা যেন সীসের মত তরল ভাবি এবং দুর্বহ হয়ে বুকের উপর চেপে বসে।

রায়বাহাদুর বলেন, নৈনিতাল থেকে ফিরে তুই কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস, মা!

রায়বাহাদুরের নিশ্বাসটা যেন এই ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে গিয়ে ঘরের আলোটাকেও কেমন করুণ, উদাস ও বিহ্বল করে দিয়েছে।

জয়ন্তী বলে, তোমার ফুডটা এনে দিই, সময় হয়ে গেছে।

রায়বাহাদুর সাড়া দিলেন না। সাড়া দেবার প্রয়োজনও বোধ কবেন না।

সন্ধ্যের আর বেশি দেরি নেই। আকাশের মেঘে গোধূলির আলো ক্রমশ মলিন হয়ে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে ছোট ছোট হাওয়া উড়ে এল।

রায়বাহাদুরের মুখোমুখি সোফায় মাথা নিচু করে বসে ছিল জয়ন্তী। উল-কাঁটায় ঘর তুলছিল। সন্ধ্যার ছায়ায় রঙীন ঘরের সাজানো রূপও যেন

কেমন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। দেখে মনে হয়, অনেক বয়স বেড়ে গিয়েছে রায়বাহাদুরের এই কদিনে।

জয়ন্তী উঠে দাঁড়াল। আলোর সুইচটা টিপে দিল।

রায়বাহাদুর বলেন, কিছুদিন থেকে একটা নতুন চিন্তা আমার মাথায় ভর করেছে, জয়ন্তী।

—কী?

—শুধু মনে হয়, তোর বাপ-মা আমার উপর কি কঠিন একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা খালাস হয়ে চলে গেল!

—ওসব চিন্তা করো না। লাভ নেই কিছু। মন খারাপ হলে শরীরও খারাপ হবে।

সোফায় শরীর এলিয়ে দিলেন রায়বাহাদুর।—একা বাড়িতে থাকতে আর ভালো লাগে না, মা।

জয়ন্তী একটু চমকাল। ভয়ে কি! বলল, তুমি বরং কিছুদিন বাইরে ঘুরে এস। শরীরটা সারবে তাহলে।

রায়বাহাদুর হাসলেন।—তোকেও তো তবে যেতে হয়। কিন্তু তোর তো আবার পড়াশুনা আছে। অথচ, একলা এ-বাড়িতে থাকবিই বা কি করে?

জয়ন্তী বলল, আমি ঠিক থাকতে পারব। সকলেই তো থাকবে।

—দেখি ভেবে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল জয়ন্তী। তারপর রায়বাহাদুরের মনের গুমট অস্বস্তিটাকে ভেঙে দেবার জন্যেই বোধহয় বলল, আর্টিস্ট্রি হাউসে হিমাদ্রি রায়ের ছবির একটা একজিবিশন হচ্ছে। দেখতে যাবে, বাপি?

—হিমাদ্রি রায় তো ভালো আর্টিস্ট?

—হ্যাঁ।

—শনিবার বিকেলে যাব তাহলে। তোর কোনো কাজ নেই তো সেদিন?

—না, কলেজ থেকে সোজা বাড়ি আসব।

রায়বাহাদুর বলেন, তোর সেই বন্ধুরা—সুলতা, মৃণ্ময়ী, মেজর লাহিড়ীর মেয়ে আরতি; এরা সব আজকাল আসে না কেন, জয়ন্তী?

—পড়াশুনো নিয়ে থাকে, সময় পায় না বোধ হয়।

—সৌম্যকে একদিন আসতে বলিস না কেন ?

জয়ন্তী জবাব দিল না। হাসল একটু। ঠোঁটের কোণদুটো বিষণ্ণ, ম্লান। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, তুমি এখন বিশ্রাম কর, বাপি। আমি যাই।

পা পা করে এগুল জয়ন্তী; চৌকাঠ পার হল। বাইরে তাকালেন রায়বাহাদুর। জানলাটা খোলা। আকাশ দেখা যাচ্ছে। জ্যামিতিক আয়তক্ষেত্রের মতন ছোট্ট এক টুকরো আকাশ, ছোট বড় কয়েকটা নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রায়বাহাদুর।

নিজের ঘরে গিয়ে টেবিল ল্যাম্পের মৃদু স্বচ্ছ আলোর সম্মুখে পড়ার বই খুলে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করছিল জয়ন্তী। কিন্তু, কিছুতেই যেন তা হবার নয়। মনটা আজ কেমন বিক্ষিপ্ত, ছাড়া ছাড়া। চোখের ডিমদুটো ব্যথা করছে। বইয়ের পাতায় কালো, ছোট ছোট অক্ষরগুলো যেন অসংখ্য পিঁপড়ে। কপালের দুপাশে কেমন একটা দ্রুতলয় উত্তেজনা। টেবিলে মাথা রেখে ভাবতে লাগল জয়ন্তী।

এক সপ্তাহেরও বেশিদিন হয়ে গেল নৈনিতাল থেকে ফিরেছে জয়ন্তী। অথচ, কথা বলা দূরে থাকুক, সৌম্যর সঙ্গে শুধু একটা সাক্ষাতের মুহূর্তও খুঁজে পাওয়া যায় নি। কোথায় থাকে আর কি করে সৌম্য; কখন ইউনিভার্সিটি আসে আর কখনই যে চলে যায়, তার হদিশ পেতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে জয়ন্তী। মনে হয় জয়ন্তীর, শুধু মাত্র একটি সন্ধ্যার মায়ার স্পর্শে তার মনটাকে মধুর, চকিত আর উতলা করে দিয়ে আবার সব ভুলে গিয়েছে সৌম্য। নৈনিতাল থেকে ফিরে এলেই আবার দেখা হবে জয়ন্তীর সঙ্গে, এইরকমই একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো চলে গিয়েছিল সৌম্য !

অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা বুকে ছটফট করছিল জয়ন্তী।

কেন এমন হয়। টেবিলে মাথা রেখে জয়ন্তী ভাবে। কে জানে, আর কোথাও, অন্য কোনো নতুন মায়ার চোখে ধরা পড়েছে কিনা সৌম্য, আর সেই মায়ার শাসনেই জয়ন্তীর মুখটাকে নতুন করে মনে করতে ভুলে গিয়েছে হয়তো! যদি সত্যি সত্যিই ভুলে যায় সৌম্য, তাহলে! তাহলে আর কি! সেই ভুলটাকেই বুকের মাঝে ফুলের মতন ধরে রাখবে জয়ন্তী। অবুঝ হৃদয়টাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মনে মনেই হঠাৎ হেসে ফেলল জয়ন্তী।

কয়েকদিন আগেকার একটা বৃষ্টির সন্ধ্যা তার মন ভিজিয়ে দিল।

সৌম্য ভাবছিল অন্য কথা। অরুন্ধতীর জন্য তার মনের অসহিষ্ণু জ্বালাটা শেষ পর্যন্ত কবে যেন শান্ত হয়ে গিয়েছে। পরিচয় আগেই হয়েছিল, এখন অন্তরঙ্গ বলা যায়। প্রিয়নাথবাবুর স্ত্রী কল্যাণীর অনুরোধে শুধুমাত্র একটা বেড়াতে যাবার তুচ্ছ ঘটনা যেন এতদিনের সমস্ত উদ্বেগ আর উত্তেজনার বুকে গাঢ় প্রশান্তির ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে!

এখন ব্যাপারটা চিন্তা করতে গিয়ে সৌম্য কিছুটা আশ্চর্য হয়। আর কোনো বাধা নেই, ব্যবধান নেই, সঙ্কোচ নেই। ভাবতে অবাক লাগে, কি করে তা সম্ভব হল।

সকালেও এসেছিল অরুন্ধতী। কথা বলে আর গল্প করে অনেকটা সময় এলোমেলো করে দিয়ে গেছে। যাবার সময় বলে গেল, বিকেলে সেই জায়গায় অপেক্ষা করো। ঠিক চারটে পঁয়ত্রিশে আমি আসব। মাকে বলে রেখেছি, আজ কলেজে একটা ফাংশন রয়েছে, ফিরতে দেরি হবে।

সৌম্য হেসে বলেছে, মন্দ নয়। কিন্তু অভ্যাসটা ক্রমশ বদভ্যাসে দাঁড়াচ্ছে, খেয়াল করেছ?

উত্তরে ভ্রূকুটি করেছে অরুন্ধতী।

দেয়ালে ক্যালেণ্ডারে নটরাজের রুদ্র মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল সৌম্য। চারটে পঁয়ত্রিশ! এখন মাত্র সাড়ে নটা। সময়ের ব্যবধানটুকু মনে মনে একবার হিসাব করে নিল সৌম্য। তারপর ইউনিভার্সিটি যাবার জন্য নিচে নেমে এল।

রৌদ্র-ছায়ায় একটু একটু করে পিছু হটছে সময়। দেখতে দেখতে দু-ঘণ্টা পার হয়ে গেল।

ইউনিভার্সিটি গিয়ে সময় মতো প্রথম ক্লাশটা করল সৌম্য। তারপর বেরিয়ে এল। মাঝে দুটো পিরিয়ড নেই। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত। উত্তরোল হাওয়া বইছে বাইরে ইউনিভার্সিটির লনে। কোনো দূর অরণ্য-ধ্বনির মতো বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দ ভেসে আসছে। কান পেতে শুনল সৌম্য। ঝিরঝির বাতাসে মনটা কেমন হালকা হয়ে গেল।

এখন দুপুর। ক্ষুরের ফলার মতো উজ্জ্বল রোদে ফুটপাথ তেতে উঠেছে। ঘড়-ঘড়, ঘড়-ঘড এক ধরনের বিশ্রী, বিরক্তিকর শব্দ করে হাঁপানি রুগীর মতো শ্বাস টানতে টানতে ছুটে চলেছে প্রায় যাত্রিহীন ট্রামগুলো। বিগতযৌবনা কোনো উর্বশীর মতো দুপুরের কলকাতা।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মধ্যাহ্নের এই বিচিত্র ও রিক্ত রূপ দেখতে দেখতে সৌম্য ভাবল, জীবনের ঐশ্বর্য কখনো যদি এমন রিক্ত ও শূন্য হয়ে ফুরিয়ে যায়, সেদিন সে আত্মহত্যা করবে।

কিন্তু সে-প্রয়োজন বুঝি তার জীবনে কেনোদিন আসবে না। গোপন অভিসারেব মতো হৃদয়ের নিভৃতে অরুন্ধতী যে-অদৃশ্য ঘরের কপাট খুলে দিয়েছে, সেখান থেকে ফিরে আসা তার পক্ষে বুঝি অসম্ভব।

চোখের তারা দুটি ছটফট করছিল সৌম্যর, নিশ্বাস উষ্ণ। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে আত্মলীন প্রসন্নতায় ভাবতে থাকে সৌম্য।

ছোট ছোট স্মৃতির রোমন্থন। চারটে পঁয়ত্রিশের আর কতো দেরি! কলেজ স্কোয়ারের নিঃসঙ্গ জলে রোদের ঝলকানি। ছোট চাতালের শেডের নিচে বসে একদল পশ্চিমা রামায়ণ শুনছে। ইংরিজীর ক্লাশটা আজ তেমন ভালো লাগে নি। কি যেন সেই লাইনটা!

'Doubt thou the stars are fire,
Doubt that the sun doth move,
Doubt truth to be a liar,
But never doubt I love.'

নিজের মনেই একটু হাসল সৌম্য। তারপর এগিয়ে গেল। লিফ্‌টের সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করছে তিনটি মেয়ে। দেয়ালে ম্যাগাজিনের পোস্টার। একতলার সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে দোতলায় উঠতে লাগল সৌম্য। কি একটা বিষয়ে সরব আলোচনা করতে করতে তিন চারজন ছাত্র নিচে নেমে গেল। দোতলার বাঁকের মুখে অন্যমনস্কভাবে কাউকে পাশ কাটাতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সৌম্য।

এমন আকস্মিকভাবে জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে আশা করে নি।

অস্ফুট স্বরে সৌম্য বললে, আপনি!

জয়ন্তী বলল, আপনাকেই দেখছিলাম।

শান্ত গলায় সৌম্য জিজ্ঞাসা করলে, কবে ফিরেছেন?

—দশদিন হয়ে গেল।

—ও। দেখি নি তো।

—আপনাকেও দেখি নি।

করে থাকে। জয়ন্তীর শরীরে কেমন একটা মাদকতা আছে;

আকর্ষণ করে।

বলল, বাপি আপনার খোঁজ করছিলেন।

—কেন?

—এমনি। চলুন না একদিন।

—যাব একদিন। নিশ্চয় যাব।

—কবে? আজই চলুন না?

—না, না। আজ নয়।

—কাল?

—না।

—তবে?

সৌম্য হেসে বললে, যাব একদিন।

—সত্যি যাবেন তো? জয়ন্তীর ঠোঁট কাঁপল।

সৌম্য বললে, ও-কথা কেন বলছেন?

সেই মুহূর্তে কোনো জবাব দিল না জয়ন্তী। একটু চুপ করে থেকে, অদ্ভুত হেসে বলল, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—বলুন, শুনি?

সহসা আরক্ত হল জয়ন্তী। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখাবয়বে, শুভ্র ত্বকের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সৌম্যর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চকিতে দৃষ্টি নামিয়ে নিল জয়ন্তী।

ঢং ঢং করে ক্লাশ শেষ হবার ঘণ্টা পড়ল।

ব্যস্তভাবে সৌম্য বলল, আমার যে ক্লাশ আছে!

জয়ন্তী বলল, আমারও আছে।

—চলুন যাই।

জয়ন্তী ইতস্তত করছিল।—কিন্তু....

—কী?

—এই পিরিয়ডের পর আমার আর ক্লাশ নেই। ক্লাশ শেষ হলে একটু দাঁড়াবেন; আমি আসব।

সৌম্য বলল, বেশ। কি বলবেন বলছিলেন?

—পরে বলব।

দ্রুত হেঁটে অন্যদিকে চলে গেল জয়ন্তী।

চিন্তিত মনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সৌম্য। মনের মধ্যেই খুঁজে খুঁজে একটা জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করে নিতে চাইল।...না, এখন আর ক্লাশ করা যায় না। না করলে অবশ্য একটা জরুরী লেকচার ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু, জয়ন্তীর সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার চাইতে এ বরং ভালো। এরপর দেখা হলে অত সহজে ছাড়তে চাইবে না জয়ন্তী। চারটে পঁয়ত্রিশের প্রতীক্ষা আরো অনেক বেশি স্বপ্নময়! ইচ্ছে করলেই অক্ষমতার কথাটা জয়ন্তীকে জানানো যেত, এবং না জানিয়ে সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেল। নিশ্চিন্ত হয়েই চলে গেছে ও। সৌম্য বিব্রত হয়ে পড়ল। আশ্চর্য! জয়ন্তীও যেন তাকে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বেঁধে ফেলেছে।

চিন্তার মধ্যেই আরো কিছুটা সময় অযথা নষ্ট করল সৌম্য। তারপর মনস্থির করে পা বাড়াল। পিছনে ইউনিভার্সিটির ছায়া। সেনেট হল স্তব্ধ। সিঁড়ির নিচে ফুটপাথে এক বৃদ্ধ মলাট ছেঁড়া পুরনো বইয়ের দোকান সাজিয়ে বসেছে। সৌম্য এগিয়ে চলল। চারটে বাজছে প্রায়। জয়ন্তী জানুক, তার অনুরোধটাকে তুচ্ছ করেই অনায়াসে চলে যেতে পেরেছে সৌম্য। নতুন করে আরো একটা অপরাধের সংখ্যা বাড়ল। আপাতত সেইটুকুই সান্ত্বনা!

নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পরই অরুন্ধতী এল। বুকের কাছে ধরে-রাখা বই খাতার ছোট্ট স্তূপটি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওঠা-নামা করছিল। ঘাড়ের উপর ছড়ানো একরাশ কালো চুলে আর ফিকে সবুজ শাড়িতে কেমন একটা স্নিগ্ধ লাবণ্য ফুটে উঠেছে। বনশ্রীর সুষমা! সৌম্য তাকিয়ে থাকল।

কাছে এসে স্পষ্ট রেখায় হাসল অরুন্ধতী। শাড়ির আঁচলটা কাঁধের পাশে একটু গুছিয়ে নিল।

—কতক্ষণ এসেছ?

সৌম্য বলল, এই তো কিছুক্ষণ।

অরুন্ধতী হেসে বলল, খুব ছেলে কিন্তু তুমি!

—কেন, কি হল আবার?

—রুবি বড় যে তোমার মামাতো বোন, সেকথা তো কোনোদিন আমাকে বল নি?

সৌম্য বিস্মিত হল।—রুবিকে তুমি চিনলে কি করে?

—বাঃ, রুবি যে আমার সঙ্গেই পড়ে।...যাক, তুমি নিশ্চয় ভাবছিলে, সত্যিই আসব কিনা আমি?

সৌম্য হেসে বলল, শুধু একটু না। বেশ ভাবছিলাম। তা ফাংশনের নাম করে যে মা-কে ফাঁকি দিলে, এখন ফাংশনটা হবে কোথায়?

অরুন্ধতী ভ্রূকুটি করল।—বা-রে, তা বুঝি আমি জানব! সে-সব তো তোমারই ভাববার কথা।

সৌম্য বলল, মানে, নরকে নিয়ে যেতে বলছ তো! ওই জায়গাটার ওপর মেয়েদের যত লোভ! অন্ধকার বেশি কিনা!

—না গিয়েও তো থাকতে পাব না। আসলে মেয়েদের না হলে তোমাদের চলে না।

কথা কাটাকাটি করতে করতে আনমনা খানিকটা পথ চলে এসেছিল। বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে এসে বাসে উঠল দুজনে।

দু-তিনদিন পরেই রুবি এল।

সম্পর্কে বোন হলেও এই বাড়িতে রুবির যাতায়াত বিশেষ ছিল না। এমন হঠাৎ যে ও এসে পড়বে, সৌম্য আশা করে নি। একটু অবাক হল।

—কি রে, এতদিন পরে কি মনে করে এলি!

ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকে সটান সৌম্যর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল রুবি। সেইভাবেই, পা-দুটো ঈষৎ দোলাতে দোলাতে, তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরটা দেখল ক-পলক। তারপর বলল, না এলেই খুশি হতে, কেমন?

সৌম্য একটু হাসল।—তা কেন?

—কেন নয়, তাই বল? রুবি উঠে বসল।—সত্যি, ছোড়দা, তুমি যে এমন একটা 'হিরো' হয়ে উঠবে, কে ভেবেছিল!

—হিরো! সিনেমা না থিয়েটারের?

তুমি [illegible] খবর দিলে না রুবি। [illegible] একবার চোখের দিকে, আর, আর [illegible] অরুন্ধতীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর [illegible] বলল, মনের।

নিঃশব্দে হাসল সৌম্য।

রুবি বলল, অরুর জ্বালায় ক্লাশে কান পাতা দায়। এত বেশি কথা বলে আজকাল! আর তেমন তেমন কথা হলে না হয় শোনা যায়! কিন্তু কানের পাশে সব সময় 'সমু, সৌম্য, সমুদা' করে শব্দরূপ মুখস্থ করলে মাথা পাগল হয় কিনা, তা তুমিই বল সমুদা?

সশব্দে হেসে উঠল রুবি। হাসির শব্দটা যেন অরুন্ধতীর নিচু মুখ আরো বেশি নিচু করে দিল। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচলে আঙুল জড়াতে লাগল অরুন্ধতী।

সৌম্যও বেশ অপ্রস্তুতে পড়েছিল। আকস্মিক আক্রমণে কি দিয়ে আত্মরক্ষা করবে বুঝতে পারছিল না। শেষে বলল, ওর কথা না শুনলেই পারিস।

—হুঁ, তাই তো। রুবি ভুরু কোঁচকাল। তারপর হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাই কর, ছোড়দা, কিচ্ছু বলব না। কিন্তু উলু দেবার সময় আমাকে ডাকতে ভুলে যেও না যেন!

সৌম্য হাসল।

বেরিয়ে যেতে যেতে রুবি বলল, যাই, পিসীমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

অসহ্য লজ্জায় কাঁপতে কাঁপতে অরুন্ধতীও রুবির সঙ্গী হবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। হালকা ধমক দিয়ে রুবি বলল, তুমি আবার পিছু পিছু আসছ কেন, বাছা! আমাব মৌচাকে তো কোনো মধু নেই!

দমকা বাতাসের মতন তাড়াহুড়ো করে চলে গেল রুবি। ওটা ওর স্বভাব। সব সময় ব্যস্ত, অস্থির। এক ধরনের যৌবন, আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারে যার কোনো পক্ষপাত নেই। সহজ, স্বচ্ছ, প্রবল! রুবি চলে যাওয়ার পর সৌম্য আত্মস্থ হবার সুযোগ পেল।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তখনো তেমনিভাবে কাঁপছিল অরুন্ধতী। শাড়ির আঁচলটা অসাবধানে লুটিয়ে পড়েছে মেঝেয়। সৌম্য দেখল, অরুন্ধতীর খোঁপার ছাঁদটা ভেঙে কাঁধের উপর স্তবকে স্তবকে ছড়িয়ে গিয়েছে। পাতলা,

রক্তাভ ঠোঁটের কলিদুটো কেমন ভিজে ভিজে; থিরথির করে কাঁপছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সৌম্য। অরুন্ধতীর হেঁট মাথাটাকেই দু-হাতে বুকে জড়িয়ে ধরল। অরুন্ধতী বাধা দিল না, সাড়া দিল না কোনো। এবং, যেন অরুন্ধতীর এই নীরবতার ভাষাটাকেই অবিশ্বাস করে সৌম্যর চোখে, মুখে আর দুই হাতের আগ্রহে বিপুল এক বিশ্বাসের ঝড় উথলে উঠতে চাইছিল।

অনেকগুলি দিন এইভাবে কেটে গেল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরিয়ে ঝরিয়ে কবে ফিরে গিয়েছে শ্রাবণ। এখন আশ্বিনের শুরু। জানলার বাইরে অনেক দূরের আকাশে তাকালে এখন নরম তুলোর মতন ধবধবে আর ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘগুলিকে স্পষ্ট দেখতে পায় সৌম্য।

ইদানিং ও নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করছিল। পুরনো দিনগুলি ক্রমশ যেন হারিয়ে যাচ্ছে। চিন্তার স্তরে স্তরে কেমন একটা ধূসর বিবর্ণতার ছাপ। সেল্ফের বইগুলোয় প্রায় অব্যবহারে ধুলো জমছিল। সরস্বতীর সঙ্গে সব সম্পর্ক যেন এর মধ্যেই শেষ করে ফেলেছে! দিবারাত্রি যত কিছু চিন্তা; ভালমন্দ, সম্ভব অসম্ভব যা কিছু পরিকল্পনা, সবই অরুন্ধতীকে ঘিরে! ·যেন এক দুর্নিবার আকর্ষণে সর্বস্ব ভুলিয়ে অরুন্ধতী তাকে অন্যপথে টেনে নিয়ে চলেছে! না, এইভাবে নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতটাকে ভুলে গেলে চলবে না। অরুন্ধতী ছাড়াও আরো একটা বাইরের জগৎ রয়েছে; এবং সেখানে আর কিছু না থাকুক, পৌরুষ রয়েছে, সম্মান ও ব্যক্তিত্ব রয়েছে।

অনেক ভেবে চিন্তে নতুন প্রতিজ্ঞায় মন স্থির করল সৌম্য। অরুন্ধতীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ইচ্ছে করেই বন্ধ করে দিল। এই ভালো, এই তার পথ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্নের গৌরবটাকে এমনি করেই সে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আত্মপ্রসাদে মন ভরে উঠল সৌম্যর।

কিন্তু এই মনোভাব বেশিদিন বেঁচে থাকল না। পাঁচ-ছ দিন পরে হঠাৎ এক সকালে সৌম্য আবিষ্কার করল, মনের মাঝে কোথায় যেন একটা শূন্যতা উঁকি দিয়েছে। সূক্ষ্ম অথচ জ্বালাময় একটা বেদনা সারা শরীরে প্রবাহ ছড়াতে লাগল।

বন্ধ ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সৌম্য। চাঁপা ফুলের মতন

নরম রোদ ঝকঝক করছে চতুর্দিকে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া কয়েকখণ্ড মেঘ। দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল সৌম্য। রাগ নয়, নিজেরই বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর একটা ধিক্কার। অরুন্ধতীর অপরাধ কোথায়! অপরাধ যদি কারুর হয়ে থাকে, তাহলে বরং তারই হয়েছে। আর, শুধু ঘরের দরজায় খিল দিলেই তো আর মনের দরজায় খিল পড়ে না। সেখানে যে অদৃশ্য নূপুরের ধ্বনি প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র সুরে অনুরণন জাগিয়ে রেখেছে!

সৌম্য চঞ্চল হয়ে পড়ল।

নিরালা, নির্জন ছাদের কোণে বড় বড় দুটো জলের ট্যাঙ্কের পাশে সহসা মুখোমুখি দেখা হল অরুন্ধতীর সঙ্গে। ভিজে শাড়ি রোদ্দুরে শুকতে দিতে এসে এমন অসহায় মুহূর্তে ধরা পড়ে গিয়ে পালাবার পথ খুঁজে পায় না অরুন্ধতী।

সৌম্য ডাকল, অরুণি!

বারেক তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিল অরুন্ধতী। চোখের তারা দুটো যেন জলভরা মেঘ—রহস্যময়, থমথমে। প্রথমে কোনো কথা বলল না। তারপর, একটু থেমে মৃদু কম্পিত স্বরে অনুযোগ করল, সম্পর্ক রাখতে চাও না বুঝি। লুকিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?

সৌম্য বলল, তুমি নিশ্চয় খুব রাগ করেছ। কিন্তু দোষটা হয়তো ঠিক আমারও নয়। শিবের বিয়ের গল্প তোমার মনে আছে? সেই যে, মহাদেবকে স্বামীরূপে পাবার জন্যে বিপদসঙ্কুল পর্বতে দিনের পর দিন তপস্যা করতে হয়েছিল উমাকে। এ-যুগে মহাদেবরাই উমার তপস্যা করে। আমার উমাকে তো আমি আগেই পেয়েছি। বর্তমানে চলছিল সরস্বতীর কৃপালাভের তপস্যা। দেখছ না, দিনগুলো কি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। পড়াশুনার দিকে একটু-আধটু নজর না দিলে কি করে উদ্ধার হব বল!

অরুন্ধতী বলল, বারে, নিজেই শুধু উদ্ধার হবে বুঝি! আর আমি মাঝ দরিয়ায় পড়ে হাবুডুবু খাব?

সৌম্য হেসে বলল, তা কেন! তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে এই অধম আছে।

সৌম্যর ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে চপল কণ্ঠে অরুন্ধতী বলল, যাট, যাট, অত বিনয়ে কাজ নেই।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে উষ্ণ নিশ্বাস ঝরিয়ে অরুন্ধতী বলল, যাক, আমি এখন চলি। কতক্ষণ এসেছি। পিসির চোখ বাঘের চোখ। এক্ষুনি চেঁচামেচি [illegible]।

—[illegible] করুক। আমি তোমায় এখন ছাড়ছি না। কতদিন পরে দেখা হল, জমাখরচ এখনো সব বাকি।

অরুন্ধতীর মসৃণ হাতটাকে নিজের মুঠির মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরল সৌম্য। তারপর বলল, অরু, আজ সত্যি তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। দেহের গন্ধ মনের গন্ধ সব যেন এক হয়ে গেছে!

অসহায়ের মতন হেসে অরুন্ধতী বলল, এখনো তুমি ছেলেমানুষ থেকে গেছ। হাতে পেলে সব জিনিসই ভাঙতে চাও।

দিন কয়েক পরে কলেজে যাবার আগে হঠাৎ এ-বাড়িতে এল অরুন্ধতী। বলল, শোন, আমাকে একটু বাস স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দেবে? দরকার আছে।

সৌম্য বলল, হঠাৎ এ আদেশ! কী ব্যাপার?

অরুন্ধতী বলল, আদেশ মনে কবলে, তাই। চলই না, সব বলছি তোমাকে।

সৌম্য ওর সঙ্গী হল। আশ্বিনের হাওয়ায় এখন শীতের আমেজ। পাশাপাশি হাঁটছিল দুজনে। পথে নেমে অরুন্ধতী বলল, সাত নম্বর বাড়িতে একটা লম্বা, কালো মতন ছেলে আছে দেখেছ? চেন তাকে?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সৌম্য বলল, হ্যাঁ, চিনি। কেন!

অরুন্ধতী বলল, ছেলেটা ভালো নয়। ওই পানের দোকানটার সামনে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে। আমি কলেজ যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরুলেই পিছনে পিছনে বাসে উঠে কলেজ পর্যন্ত যায়। ছুটির পরেও দেখি কলেজের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আবার পিছনে পিছনে বাড়ি পর্যন্ত আসে। ওর গতিবিধি আমার ভালো লাগছে না।

কথা শেষ হবার আগেই সৌম্যর গা-ঘেঁসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অরুন্ধতী। বলল, দেখছ, আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সৌম্য বলল, তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এস।

পথের পাশে দিনু পানওলার পান সিগারেটের ছোট্ট দোকান। সৌম্য দেখল, দিনুর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আয়েস করে সিগারেটে টান দিচ্ছে সাত নম্বর বাড়ির সুনীল। ঘৃণায় গা জ্বালা করে উঠল সৌম্যর। ভুরু কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

সৌম্যর চেয়ে বয়সে দু-তিন বছরের বড়ই হবে সুনীল। একসঙ্গে, একই স্কুলে আর একই ক্লাশে অনেকদিন পড়েছে। শুধু দুরন্তই নয়, বখামির চূড়ান্ত হিসাবে বেশ নাম-ডাক ছিল সুনীলের। বেশ বড়লোক এক টিম্বার মার্চেণ্টের ছেলে। ক্লাশের পরীক্ষায় পিছনের দিকে থাকলেও এক চান্সেই কোনোরকমে ম্যাট্রিকের সীমানা পার হয়েছিল। তাবপর শোনা গেল, বাপের বিরাট কাঠের কারবার এবার থেকে সুনীলই দেখাশোনা করবে। স্কুলে পড়তেও সম্ভাব বিশেষ ছিল না। এই পর্যন্ত এসে পরিচয়ের ক্ষীণ সূত্রটুকুও ছিঁড়ে গেল।

তারপর কয়েকটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ পপুলাব হয়ে 'পপুলাব কেবিনে' বেশ জোরালো একটা আড্ডার আসর জমিয়ে তুলেছে সুনীল। এ-পাড়ার আব ও-পাড়াব কিছু ছন্নছাড়া, বখাটে, আধবখাটে সঙ্গী জুটিয়ে একটা ড্রামাটিক ক্লাব খুলেছে, প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক সে নিজেই। ভাঙা-ভাঙা গাল, ঘাড় পর্যন্ত বাহাবে চুল মাথায় পপুলাব কেবিনের ভিতবে বসে কতকগুলি ছেলে গরম গরম ডায়লগ আওড়ায়; ধারাল মন্তব্য অবলীলায় ছুঁড়ে দিয়ে পথচারিদেব কাবু করে দিতে চায়। পপুলার কেবিনের এই নোংবামির ইতিহাস অনেকেই জানেন। বহুদিন পরে একটা অশুভ ইঙ্গিতের মতো হঠাৎ সুনীল-প্রসঙ্গ মনের মধ্যে এসে পড়ায় চিন্তিত হল সৌম্য।

বাস স্টপে পৌঁছে সৌম্য বলল, মাঝপথে অমন থমকে দাঁড়ালে যে। লোকে কি মনে করল বল তো!

অরুন্ধতী বলল, লোকে তো অনেক কিছুই মনে কবে। তুমি কিছু মনে না করলেই হল। সত্যি, আমার ভীষণ ভয় করে।

অল্প হেসে সৌম্য বলল, অত ভয় পাবার কি আছে! হয়তো ওর মনে সত্যিই কোনো দুরভিসন্ধি নেই। শুধু তোমার ভুল।

অরুন্ধতী বলল, ভুল কি আর বার বার হয়!

সেই সময় বাস এল। হাসতে হাসতে চলে গেল অরুন্ধতী।

মনের এই দ্বন্দ্ব, এই সন্দেহ এবং সন্দেহের এই ভয় সত্যিই বড় জটিল। কোথাও যেন এর মীমাংসা খুঁজে স্বস্তি পাওয়া যায় না। খুলতে গিয়ে নিত্য নতুন সন্দেহের জট পাকিয়ে যায়! ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এল সৌম্য।

তিন চার দিন পরে দোতলায় সৌম্যর পড়ার ঘরে আবার হাসতে হাসতে ছুটে এসে অরুন্ধতী বলল, সৌম্যদা, তোমার সেই বন্ধুটি আজ আর পথে নয়; সোজা বাড়িতে এসে ঢুকেছে।

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না সৌম্য। তারপর প্রশ্ন করল, হঠাৎ?

চপল হেসে অরুন্ধতী বলল, দরকারটা অবশ্য বাবার সঙ্গে। ওদের একটা যাত্রাপার্টি না কি আছে যেন, পরশু তার বার্ষিক উৎসব। বাবাকে নাকি ওরা প্রেসিডেন্ট করবে, তাই বলতে এসেছিল।

কেঁপে কেঁপে হাসছিল অরুন্ধতী।

সৌম্য জিজ্ঞাসা করল, কাকাবাবু কি বললেন?

অরুন্ধতী বলল, বলবে আবার কি! যে ভাবে মাকড়শার মতো চেপে ধরেছিল, বাবা না করতে পারলেন না। ও-ছেলে কী কম! সেদিনই তোমাকে বলেছিলাম, ভীষণ অসভ্য ওই ছেলেটা।

অরুন্ধতী চুপ করল। কোনো প্রতিবাদ না করে, গম্ভীর হয়ে, যেন চিন্তার ভিতরে একটা গভীর প্রশ্নের জ্বালা মাখিয়ে ভাবতে থাকে সৌম্য। কী চায় সুনীল? আর সুনীলের ওই অন্তরঙ্গ হবার দুরন্ত প্রয়াসটারই বা অর্থ কী?

অর্থ খুঁজে পাওয়া যাক না যাক, দিনে দিনে সৌম্যর চিন্তাটাকে আরো বেশি চিন্তিত করে দ্রুতগতি সময় এগিয়ে চলে। দেখতে দেখতে পূজো এসে গেল। আকাশে বাতাসে, মেঘে মেঘে, ফুলে ফুলে এবং পাতায় পাতায় হেমন্তর প্রথম স্পর্শ নতুন যৌবনের স্বাদ ছড়াল। শুকনো পথের উপর এখনই ছোট ছোট ধুলোর ঝড় ওঠে।

অরুন্ধতী বলল, কি হয়েছে তোমার? কদিন থেকে দেখছি, কেমন ছাড়া ছাড়া, গম্ভীর ভাব!

সৌম্য বলল, কিছু হয় নি, কিছু না।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে চলে গেল অরুন্ধতী।

দুপুরবেলায় যখন চতুর্দিক নির্জন, হাওড়া ব্রীজের উপরের প্রকাণ্ড আকাশটাকে মনে হচ্ছে আশ্চর্য নীল, সেই সময় আবার এল অরুন্ধতী।

চোখ তুলে দেখে, সৌম্য বলল, বস।

অরুন্ধতী বলল, না, বসব না, কথাও বলব না। কি হয়েছে তোমার! সব সময় মুখ গোমড়া! হাস না কেন?

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে সৌম্য বলল, হয়েছে? এবার বল?

অরুন্ধতী বলল, সেই ছেলেটা আজ আবার এসেছিল বাবার কাছে।

—তারপর?

একটু থেমে অরুন্ধতী বলল, বাবা কি বলেন, জান?

—কি?

—বাবা বলেন, ছেলেটা নাকি অদ্ভুত পরোপকারী। এমন ছেলে নাকি আজকাল দেখা যায় না।

সৌম্য একটু চমকাল। সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যেই প্রিয়নাথকে বেশ বশ করেছে সুনীল, এবং অনেক স্তুতিও কুড়িয়েছে! অরুন্ধতীও যেন সেই স্তুতিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে!

বিরক্ত হয়ে সৌম্য বলল, বাবা বলেন, আর তুমিও নিশ্চয় তাই?

সহসা যেন নিজেকে ডানার ভিতরে গুটিয়ে নিল অরুন্ধতী। অভিভূতের মতো সৌম্যর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপরেই তীক্ষ্ণ, নিঃশব্দ হেসে বলল, মেয়েরা যাকে একবার ঘৃণা করে, সহজে তাকে ভালো চোখে দেখতে পারে না, সমুদা। তোমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমিও আমাকে ভুল বুঝলে।

ঠোঁট কামড়ে ধরল অরুন্ধতী।

রুদ্ধ কণ্ঠে সৌম্য বলল, ভুল বুঝি নি, অরুণি। ভুল বোঝবার মতো মনের জোর আজ আর আমার নেই। ভয় পেয়েছি।

—ভয়! কেন!

জোর করে হাসতে চেষ্টা করল অরুন্ধতী।

সৌম্য বলল, তুমি বুঝবে না অরুণি। সব কথা বোঝানো যায় না।

আবেগ, উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে অরুন্ধতীর ডান হাতের নরম কবজিটা চেপে ধরল সৌম্য। কাঁপছিল অরুন্ধতী। সৌম্য দেখল, নীল, সূক্ষ্ম একটা শিরা ফুটেছে অরুন্ধতীর গলায়।

অরুন্ধতী বলল, আমার যা-কিছু, সবই তোমাকে দিয়েছি। আমি অন্ধ, এখন তোমার চোখই আমার দৃষ্টি। শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ! তুমি অন্ধকারে ঠেলে দিলে, আমি দাঁড়াব কোথায়!

সৌম্যর বুকের ভিতর একটা যন্ত্রণাক্ত নিশ্বাস হাঁসফাঁস ক'রে। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে, এতক্ষণের এত মুখরতার সব শক্তি হারিয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সৌম্য। অরুন্ধতীর মাথাটা হেঁট হতে হতে ক্রমশ ওর বুকের কাছে নেমে আসছিল।

অনেকক্ষণ পরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সৌম্য বলল, আমায় ক্ষমা কর।

স্তব্ধ নদীর শান্ত নিস্তরঙ্গ জলে হঠাৎ একটা ছোট ঢিল পড়ল।

মাসের পর মাস, পুরোপুরি একটা বছরই ইতিমধ্যে পার হয়ে গিয়েছে। সেই গত শ্রাবণে বেলেঘাটার বাড়ি ছেড়ে এই বাড়িতে এসেছিলেন প্রিয়নাথ বাবু; আর, আজ এই নতুন শ্রাবণ। সকালবেলায় ঘরের ভিতরে বসে পাঁজির পাতা ওলটাতে ওলটাতে প্রিয়নাথ ভাবেন।

পরীক্ষা দিয়েছিল অরুন্ধতী। রেজাল্ট বেরুলে, পাশের খবরটা এ-বাড়িতে সৌম্যই প্রথম আনল। খবর শুনে প্রিয়নাথ, কল্যাণী দুজনেই হাতের কাজ ফেলে ছুটে এলেন। কল্যাণী বললেন, অরু যদি পাশ করে থাকে, তোমার জন্যেই করেছে, সৌম্য।

স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, হ্যাঁ। একেবারে খাঁটি কথা। সৌম্য যে-ভাবে উঠে-পড়ে লেগেছিল, মনে হচ্ছিল যেন ওরই পরীক্ষা।

আর এক মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা করল না সৌম্য। দোতলার সিঁড়ি ধরে দ্রুত উপরে উঠে গেল।

ছাদের কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল অরুন্ধতী। সিঁড়ির মুখে সৌম্যকে দেখতে পেয়ে একটু কাঁপল। হাসল নিঃশব্দে।

কাছে এসে সৌম্য বলল, পাশ করে দুটো পাখা গজিয়েছে দেখছি। আগে দেখতুম, সব সময় যখন-তখন পায়ে পায়ে ঘুরতে। এখন একেবারে ডুমুর-ফুল।

লজ্জিতভাবে মাথা নিচু করল অরুন্ধতী।

সৌম্য বলল, কই, গুরুপ্রণাম করলে না এখনো?

মৃদু হেসে অরুন্ধতী বলল, আর বোধ হয় তা করা হল না, সৌম্যদা। বিপদের আভাস পাচ্ছি।

—কেন, কি হল আবাব ?

—এই, চেঁচিও না অত। মা বাবা শুনতে পাবে। গর্বে তো দেখছি নিশ্বাস পড়ছে না। আর, অতই যদি প্রণাম নেবাব লোভ, তাহলে তোমার ঘবে চল। এখানে নয়।

সৌম্য হেসে বলল, তাই চল।

ঘবে এসে হাঁফ ছাডল অরুন্ধতী। বলল, এইবার যত খুশি চেঁচাও, যা খুশি কর। দেখি, বুকটা কতখানি উঁচু হয়েছে।

সৌম্যব বুকে হাত রেখে এগিয়ে গেল অরুন্ধতী। নিবিড বাহু বেষ্টনীর মধ্যে অরুন্ধতীর কোমল, ভীরু ও লাজুক দেহটাকে বন্দী করে সৌম্য বলল, যতই উঁচু হক, এখনো এ-বুকে তোমাকে ধবে রাখতে পাবি।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, খুব মৃদু অথচ খুব স্পষ্ট স্বরে, যেন সৌম্যর বুকে ঠোঁট ছুঁইয়েই অরুন্ধতী বলল, কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবে তো।

সৌম্য বলল, কেন! তোমার কি সন্দেহ হয় ?

সৌম্যর বাহু বেষ্টনী আরো সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় হল। অস্ফুট আর্তনাদ করল অরুন্ধতী। তারপব মধুর হেসে বলল, আজকে যেন তোমার শক্তিও বেড়ে গেছে!

বিকেলে রুবি এল। রুবি বেশ ভালো ভাবেই পাশ কবেছিল। বিভাময়ীকে প্রণাম কবে, এবং অন্যদিনের মতো চপলতা ও বাচালতা না কবে গম্ভীর স্বরে বলল, ছোড়দা, শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

নির্জনে এসে রুবি বলল, অরুর বিয়ের কথাবার্তা চলছে, শুনেছ ?

প্রায় চমকে উঠেছিল সৌম্য।—বিয়ে!

রুবি হাসল।—হ্যাঁ। চমকালে যে।

সৌম্য বলল, কই, আমি তো কিছুই জানি না। পাত্রটি কে ?

রুবি ভ্রুকুটি করল, তাই তো জানতে চাই। কেন, তুমি নও ?

সৌম্য বলল, না, বিশ্বাস কর, আমি এ-বিষয়ে কিছুই জানি না।

কিছুক্ষণ স্থির শূন্য দৃষ্টিতে সৌম্যর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হেসে ফেলল রুবি।—বুঝেছি। অরুর মতলবটাও ধরতে পেরেছি।

সৌম্য বলল, তার মানে।

রুবি বলল, মানে না বুঝতে পারার মতো বোকা তুমি নও, ছোড়দা। সাবধান, আমাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করো না।

জুতোর হিলে শব্দ তুলে রুবি চলে গেল। আর, সেদিকে তাকিয়ে স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সৌম্য। শূন্যতা ছাড়া সেখানে আর কিছু ছিল না।

মাথার ভিতর রুবির কথাগুলি এলোমেলো বিক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরছিল। রাত্রে খেতে বসে ইতস্তত করতে করতে বিভাময়ীকে কথাটা জিজ্ঞাসা করল সৌম্য। —অরুর বিয়ে নাকি, মা?

বিভাময়ী প্রশ্ন কবলেন, তোকে কে বলল?

সৌম্য বলল, রুবি বলছিল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিভাময়ী বললেন, সেই রকমই কথাবার্তা চলছে। তবে এখনো কিছুই ঠিক হয় নি।

সৌম্যর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। শিরা স্নায়ুতে কেমন একটা যন্ত্রণা। কোনোরকমে খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি উঠে পডল সৌম্য।

সমস্ত রাত ঘুম নামল না চোখে। মস্তিষ্কের ভিতর অজস্র মৌমাছি যেন বিষাক্ত হুল ফুটিয়ে মাথাটাকে ভীষণ ভারি এবং শূন্য করে দিয়েছে। বাতিটা নেভানো। রাত বাডছিল। অন্ধকার ঘবেব ভিতর শুধু কয়েকটা বড় বড় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কিছুক্ষণ ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাজতে থাকল।

মাথা হেঁট করে আর এক হাতে কপাল টিপে ধরে, যেন মাথার ভিতরের একটা গভীর কামড়ের জ্বালা সহ্য করতে চেষ্টা করছিল সৌম্য। জানল না সৌম্য, কখন ভোর হল, পাখি ডাকল, আর দূরের সুপারি গাছের সবুজ পাতার উপর কাঁচা রোদের আলো হেসে লাল হয়ে গেল।

যেন স্বপ্নের ঘোরেই একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে ওঠে সৌম্য, মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে। ক্যালেণ্ডারের তারিখগুলো যেন আরো উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে নাচানাচি করে, একটার পর একটা বিদ্রূপের হাসি উপহার দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। পায়চারি করে করে পায়ের পাতাও

অবশ হয়ে ভেঙে পড়তে চায়; গলার ভিতরটাও জ্বালা করে। অরুন্ধতীকে ভালবাসে সৌম্য। এত গভীরভাবে আর কাউকে বুঝি কখনো ভাল-বাসে নি। কিন্তু বুকের এই ভালবাসাটাই যে একটা মস্ত বড় অপরাধ, সে-কথা তো এর আগে কেউ বলে দেয় নি, বুঝতেও পারে নি। বুকের ভিতরের সব কৌতূহল এখন উতলা হতে ভুলে গিয়েছে। মনের মোহগুলিও যেন সহসা ভয় পেয়ে শিউরে উঠেছে। হাতের মধ্যে অরুন্ধতীর হাতটাকে চিরকালের জন্য ধরে রাখবার স্বপ্নটাও আর চঞ্চল হতে পারছে না। মনের গভীরে গোপন করা সব প্রতিজ্ঞা যেন একটা আকস্মিক নিষ্ঠুরতায় ভেঙে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

দেখতে দেখতে আরো কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল।

এই দুশ্চিন্তার মধ্যে প্রথমেই যাকে মনে পড়ল সৌম্যর, সে জয়ন্তী।

সব শুনে জয়ন্তী বলে, না, সৌম্য, অস্থির হলে চলবে না। সামান্য একটা ঘটনাকেই যদি তুচ্ছ করে না দিতে পার, তাহলে ভবিষ্যতে অনুশোচনা করতে হবে।

সৌম্য হাসে।—জয়ন্তী, তুমি যদি আজ আমার অবস্থায় পড়তে, তাহলে বুঝতে, যে-ঘটনাকে তুমি সামান্য বলে মনে করছ, তা মোটেই সামান্য নয়। ভেবে ভেবে আমি কোনো কাজ করতে পারছি না। সব সময় মনে হচ্ছে, এই বুঝি সকলের কাছে ধরা পড়ে গেলাম।

জয়ন্তী হেসে বলে, অন্যের কথায় কাজ কি। নিজের কথা ভাব। অরুন্ধতীকে তুমি বিয়ে কর।

—বিয়ে।

—হ্যাঁ, সৌম্য। বিয়ে। তোমার এই ভাবনা, এই ভয়, সব শেষ হয়ে যাবে, যদি তুমি অরুন্ধতীকে বিয়ে কর।

মাথা হেঁট করে, চোখ-মুখ একেবারে বিবর্ণ করে আর বোবা হয়ে বসে থাকে সৌম্য।

সৌম্যর মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে জয়ন্তী হাসে।—আমার কথাটা কি তুমি ভুলেই গেলে, সৌম্য?

সৌম্য চমকে ওঠে, কি বলছ, জয়ন্তী! বিয়ে করার কথা তো আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবি নি।

জয়ন্তী বলে, কোনোদিন ভাবনার কারণ ঘটে নি বলেই তো ভাবতেও হয় নি। আজ যখন ভাবতে হচ্ছে, তখন—

আনমনার মতো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, গলার স্বরের একটা রুদ্ধ আবেগকে কোনোমতে চেপে রেখে, আস্তে আস্তে সৌম্য বলে, আমি চাইলেও অরুন্ধতীর বাপ-মা চাইবেন কেন! আমি এখনো ছাত্র, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এরকম অবস্থায়, জয়ন্তী, তুমিই বল, কি করে সম্ভব?

সৌম্যব মুখেব দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যায় জয়ন্তী।—ভবিষ্যৎ তোমাব অনিশ্চিত নয়, সৌম্য। ওটা তোমার ভুল ধাবণা। অরুন্ধতীর মা-বাবাব কাছে তুমি বলেই দেখ। অরুন্ধতী তোমাকে চায়, তাকে দাবী করবার অধিকার তোমার আছে।

অসহিষ্ণুভাবে সৌম্য বলে, তুমি আমাব কথাটা একেবারেই ভাবছ না,

জয়ন্তী হাসে, হয়তো সত্যিই তোমার কথা ভাবছি না, সৌম্য। কিন্তু, আরো একজনের কথা ভাবছি।

—আরো একজন!

—হ্যাঁ, অরুন্ধতী। কি করব, আমিও যে মেয়ে। না ভেবে পারি না।

সৌম্যর হাতটাকে শক্ত কবে চেপে ধরে জয়ন্তী। যেন এই প্রথম একটা দুঃসাহসিক কাজ কবে ফেলেছে জয়ন্তী। বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় সৌম্য, ভিজে গিয়ে চিকচিক করছে জয়ন্তীর সেই শান্ত ও নির্বিকার চোখ, যে-চোখ একটু আগে পর্যন্তও হেসে হেসে তাকে উপদেশের সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

জয়ন্তী বলে, যাকে নিয়ে আর যার জন্যে তোমার এত ভাবনা, তাকেই যে তুমি ভুলে গিয়েছ! তুমি পুরুষ, কিন্তু অরুন্ধতী মেয়ে। মেয়েদেব ভালবাসা তুমি বুঝবে না, সৌম্য। তুমি বাইরের আনন্দে ভুলে থাকতে পারবে; কিন্তু সে কোন আনন্দ নিয়ে ভুলে থাকবে? সারা জীবন শুধু জ্বলে পুড়ে মরবে! না, এই ভুল তুমি করো না।

জয়ন্তীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীব্র, তীক্ষ্ণ ও যন্ত্রণাক্ত একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে সৌম্য। মনে হয়, জয়ন্তীর জীবনের একটা চরম আকাঙ্ক্ষার সাধ এই মুহূর্তে জয়ন্তীর বুকের ভিতর শেষ আর্তনাদ তুলে ফুরিয়ে গেল। চোখের সামনের একটা গভীর শূন্যতার দিকে তাকিয়ে বিহ্বল স্বরে সৌম্য বলে, আমাকে বোঝাতে গিয়ে তুমি নিজেই যে কেঁদে ফেললে!

চোখ মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে জয়ন্তী বলে, তুমি ভেব না। ওটা আমার স্বভাব।

করুণ ও খিন্ন একটা হাসির আভা ফুটে ওঠে জয়ন্তীর মুখে। যেন বুক-ভরা একটা বেদনার জ্বালাকে জোর করে হাসিয়ে বুকের মধ্যেই দমিয়ে দিতে চেষ্টা করছে জয়ন্তী।

জয়ন্তীর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হঠাৎ ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় সৌম্য।

জয়ন্তী বলে, একী, চললে নাকি তুমি?

সৌম্য বলে, হ্যাঁ।

জয়ন্তী অনুনয় করে, আর একটু দাঁড়াবে না?

সৌম্য হাসে।—দাঁড়াবার সময় নেই, জয়ন্তী। আমি চলি।

ভিজে ভারী হয়ে গিয়েছে চোখেব পাতা দুটি। বড় ক্লান্ত লাগছে শরীবটা। বুকের ভিতরেও যেন হাঁফ ধরেছে। মনে হয়, জীবনেব একটা সুন্দর আশাব নাটক এইখানে সমাপ্ত হয়ে গেল। বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে একটু বিমনা হয়েই দেখতে পায় জয়ন্তী, ঝড়ে ভেঙে-পড়া একটা গাছের মতো এলোমেলো আব উদ্‌ভ্রান্ত ভঙ্গী নিয়ে ফুটপাথ ধবে ব্যস্তভাবে হেঁটে চলেছে সৌম্য। ঝাপ্‌সা চোখেব সামনে আকাশটা হঠাৎ নিচে নেমে এল।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। দূবেব গাছের মাথায় বিকেলের শেষ বোদের নিভু নিভু ছায়াটুকু ঝলক দিয়ে হেসে যায়। বিছানায় শুয়ে চোখের পাতা বন্ধ কবে আবার ভাবতে শুরু কবল সৌম্য। ঘরের ভিতব অন্ধকাব ঢুকে ক্রমশ কালো হয়ে গেল।

আর ভাবা যায় না। বগেব দু-পাশের শিরাগুলো কেউ সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে, এক্ষুণি পট্‌পট্ করে ছিঁড়ে যাবে। অরুন্ধতীর এই বাঁধন কী সত্যিই ভালবাসার বাঁধন? ভালবাসার বন্ধন কী এত যন্ত্রণার হয়!

জয়ন্তীও যেন তাব চিন্তাটাকে এলোমেলো করে দিয়ে একটা ভয়ানক ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে মনে। প্রিয়নাথদের কঠিন হৃদয়ের ঘোষণাটাকে স্বীকার করে নিলে অরুন্ধতীর সঙ্গেই যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে! বুকের ভিতর একটা স্বপ্ন জ্বালিয়ে রেখে কী নির্ভয় নির্ভরতায় একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে অরুন্ধতী! মনের অনুভবের মাঝে লুকনো সেই সুন্দর মায়ার ছবিটা সহসা যেন বীভৎস হয়ে গেল সৌম্যর। স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না জয়ন্তী,

অরুন্ধতীকে বিয়ে করার স্বপ্নটাই কী অবাস্তব আর অলীক। বেশ ভালো আর যোগ্য পাত্রের সঙ্গেই বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে অরুন্ধতীর; এবং সে যে সৌম্যর চেয়েও অনেক গুণের, তাতেও কোনো সন্দেহ রাখা চলে না। তা ছাড়া, জাতি, বর্ণের মিলও তো নেই। এই রকম সময়ে সৌম্যর মুখে একটা নতুন নিবেদন শুনতে গিয়ে প্রিয়নাথের বিস্ময়টা একটা পাগলের মতো অট্টহাসি হেসে, নিবেদনের ভাষাটাকে সমস্ত বাড়ির হাওয়ায় ছেঁড়া কাগজের মতো উড়িয়ে দেবে!

তার চেয়ে বরং বুকের বাতাসটাকে শূন্যতার হাহাকারে ভরিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকাই ভালো। যাকে বাদ দিয়ে বাঁচা যায় না, তার অভাবে মৃত্যুও হয়তো হবে না। কিংবা, হয়তো জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি একটা অনির্দিষ্ট তৃষ্ণায় আকুল হয়ে কিছুদিন ছুটোছুটি করবে। কিন্তু যন্ত্রণার ক্ষতে আলাহর প্রলেপ পড়তে কতক্ষণ! সময় সব ভুলিয়ে দেয়। আর, অরুন্ধতীও নিশ্চয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অপরিচিত ব্যথার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে।

একটা কূল-খুঁজে-পাওয়া বিশ্বাস নিশ্চিন্ত হয়ে থিরথির করে সৌম্যর বুকে। অরুন্ধতীর ছায়াটার থেকে অনেক দূরে, একটা ভীরু ভালবাসার দম্ভ নিয়ে চলে যাবে, সরে যাবে সৌম্য। প্রতি মুহূর্তের জেগে-থাকা কর্ম-কোলাহলের মধ্যে নয়, মাঝরাত্তির স্বপ্ন-ছড়ানো ঘুমের মধ্যেও নয়; চিরকালের মতো অরুন্ধতীর দেহের সৌরভটাকে নিশ্বাসের অনুভব থেকে মুছে দিতে হবে।

ঘরের আলোটা সহসা জেলে দিল সৌম্য। দেখে মনে হয়, সৌম্যর জীবনের সব আক্ষেপ মিটে গিয়েছে, বেদনাগুলিও অভিযোগ ভুলে গিয়েছে।

অনেকদিন পরে বিভাময়ীর ডাক দেওয়ার অপেক্ষা না করেই খাবার জন্য নিচে নেমে যায় সৌম্য, এবং বিভাময়ীর বিস্ময়টাকে খুশি করে দিয়ে খাবার চেয়ে বসে। বেশ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে মার সঙ্গে গল্প করতে আর কথা বলতে চেষ্টা করে সৌম্য।

—পুরী থেকে ছোট কাকীমার একটা চিঠি এসেছিল কদিন আগে, না মা?

বিভাময়ী হাসেন।—হ্যাঁ, এসেছিল বটে।

—কী লিখেছিলেন ছোটকাকীমা?

—তোকে যেতে লিখেছে। সুমন্দ এই সময় ছুটি নিয়ে এসেছে।

—ঘুরে আসলে হয় একবার।

—বেশ তো।

—কালই যাব।

—কাল।

—হ্যাঁ।

—সে কী!

সৌম্য হেসে বলে, আমার শরীরটা কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না, মা। পড়াশুনোতেও মন বসছে না। তাই একবার পুরী থেকে ঘুরে আসি। শরীরটা সারবে, আর মনটাও ভালো হবে।

শুকনো দৃষ্টি তুলে তাকান বিভাময়ী।—কিন্তু, এমন হঠাৎ কোনো কিছু ব্যবস্থা না করে কি করে যাওয়া হবে!

সৌম্য বলে, সেজন্য তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা আমি করে নেব।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, যেন চিন্তার মধ্যে কী একটা উদ্বেগ মিশিয়ে বিভাময়ী বলেন, যেতে হয় যা। কিন্তু, সামনেব মাসে এগাবোই অঘ্রান অরুর বিয়ে, এ সময়ে তোব যাওয়াটা কী ভালো দেখাবে। হাজাব হক, একই বাড়িতে অনেকদিন আছি, ওবাও আমাদেব আত্মীয়েরই মতন। কিছু মনে কবতে পারেন।

অসহিষ্ণু স্বরে সৌম্য বলে, না, মা। কলকাতা বড একঘেয়ে লাগছে। কদিন ঘুবেই আসি।

হতাশভাবে বিভাময়ী বলেন, যা ভালো বুঝিস কব। আমি আব কি বলব।

উঠে দাঁড়িয়ে সৌম্য বলে, ওদেব এসব কথা বলতে হবে না, মা।

আব সেখানে দাঁড়ায় না সৌম্য। আর বেশি দেরি নেই, সেই গুণী পাত্রকে সঙ্গে নিয়ে একটা সর্বনাশের বাঁশি বাজাতে বাজাতে হু হু করে ছুটে আসছে এগারোই অঘ্রান। যেমন করেই হক, এই অভিশপ্ত দিনেব ছায়ার নাগাল থেকে দূরে লুকিয়ে থাকতে হবে।

ল্যান্সডাউন রোডের সেই প্রকাণ্ড বাড়ির জীবনে কবেই যে পলাশ ফুটে লাল হল, আর কবেই যে আবার অবসাদে ঝরে গেল, সে-খবর জানা হল না। জয়ন্তীর চোখের সেই অশ্রুসিক্ত অনুরোধটাকেও কোনো সম্মান না জানিয়ে চলে আসতে হল। এবং শ্যামবাজারের বাড়ির সেই কালো চোখের ছায়া দুটিও নিশ্চয় এতক্ষণে অশ্রু মুছে শান্ত হয়েছে আব বিস্মিত হতে ভুলে গিয়েছে।

কলকাতা নয়, পুরী। সমুদ্রের বালুবেলায় দাঁড়িয়ে আদিগন্ত বিস্তৃত সফেন নীল নীল ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে সৌম্যব চোখের হাসিটা যেন কেঁদে কেঁদে হাসতে থাকে। ভাবতে অবাক লাগে, কত সহজে আর অনায়াসে একটা জটিল মায়ার বন্ধনকে চিরদিনের মতো ছিন্ন করে দিতে পারল!

দেখতে দেখতে অনেকগুলি দিনই তো ফুরিয়ে গেল! আজকেই ছোট কাকীমার বাড়ি থেকে বেরুবাব সময় ক্যালেণ্ডারের তারিখটা স্পষ্ট চোখে পড়েছে এবং বুঝেও নিয়েছে সৌম্য, এগারোই অঘ্রানের আব বেশি দেরি নেই। আজ এই শনিবার, আর তারপর মাঝের আব দুটো দিন বাদ দিয়েই যে দিন, সেই মঙ্গলবারই হল এগারোই অঘ্রান!

দূরের সমুদ্রে বিকেলের আলো মুছে গিয়ে সন্ধ্যার আঁধার নামছে। সোনালি জলের বুকে শেষ হাসি ফুটিয়ে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে সূর্য। তীর-ভাঙা অজস্র তরঙ্গের আঘাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলল সৌম্য।

সন্ধ্যে হল। রাত হল। বালুচর এখন নির্জন। বুকের উপর মাথাটা নেতিয়ে পড়ে সৌম্যর। আর চোখের কোণ দুটো তপ্ত হয়েই ভিজে যায়। একসঙ্গে মনের ভিতর অনেক জ্বালা আর অনেক সন্দেহ ছটফট করে। একটা স্বার্থপরতা করতে গিয়ে, কে জানে কোন বিপদের মধ্যে অরুন্ধতীকে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পালিয়ে এসেছে সৌম্য!

হু হু করে আর্তনাদ ছুঁড়তে ছুঁড়তে সন্ধ্যার হাওয়া ফিরে যাচ্ছিল। হাঁটুর উপর মাথা রেখে আর বদ্ধ নিশ্বাসের একটা গুমট বুকের মধ্যে থেকে

তাড়াবার বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সৌম্য। তারপরেই বালির উপর দিয়ে ছোটকাকীমার বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে। মনে হয়, এই যন্ত্রণার কুণ্ডে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে কলকাতায় থাকা বরং ভালো ছিল।

এখানে আসবার কথাটা বিভাময়ীর কানে তুলে দিয়েই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় নি। বিভাময়ীর উদ্বেগটাকে বুঝিয়ে শান্ত করে দিলেও, তারপরে আবার বিনয়বাবুর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছে সৌম্য।

বিনয়বাবুকে তবু সহ্য হয়েছিল। যাকে সহ্য হয় নি, সে অরুন্ধতী।

নিঃশব্দে, লুকিয়ে বলা যায়, চলে আসবার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ কি করে সব কিছু জেনে ফেলেছে অরুন্ধতী।

সন্ধ্যায় ট্রেন। দুপুরে জানলার বাইরে রুক্ষ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল সৌম্য। হঠাৎ চমকে ওঠে।

দরজার সামনে অরুন্ধতী দাঁড়িয়ে। চোখ দুটো অপলক। একটা অভিমানের প্রশ্ন যেন সিরসির করছে সমস্ত মুখে। এক সপ্তাহেরও বেশি দিন হয়ে গেল দেখা হয় নি অরুন্ধতীর সঙ্গে। মাত্র এক সপ্তাহ। কিন্তু, সৌম্যর মনে হল, যেন একটা যুগ পার হয়ে গিয়েছে। এই এক যুগে যেন সমস্ত চেহারার রূপ বদলে নিয়েছে অরুন্ধতী।

শিউরে উঠে চোখ নামিয়ে নিয়েছে সৌম্য।

কেমন যেন ভয়ে-ভয়ে আর থেমে থেমে অরুন্ধতী বলেছে, তুমি চলে যাচ্ছ!

—হ্যাঁ। কম্পিত স্বরে বলেছে সৌম্য।

—কিন্তু

কিছু একটা বলতে চেয়েছিল অরুন্ধতী। কিন্তু সে-সুযোগ সৌম্য তাকে দেয় নি। রূঢ় কণ্ঠে বলেছে, কিন্তু-র প্রশ্ন নয়, অরুন্ধতী। কেন আমি চলে যাচ্ছি, থাকতে চাইছি না, তা হয়তো আরো পরে তুমি বুঝবে। যা কখনো সম্ভব হবে না, তা নিয়ে মিথ্যে দুঃখ করে লাভ নেই।

—সৌম্যদা!

আচমকা আর্তনাদ করে, যেন ঘরের বাতাসটাকেই থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়েছে অরুন্ধতী।

তার পরের দৃশ্য আর ভাবা যায় না। কোনো কথাই আর বলে নি অরুন্ধতী। আর মুখের ভাব দেখে মনে হয়েছে, হাসি কান্না ভুলে যেন

একেবারে ভয়শূন্য হয়ে গিয়েছে অরুন্ধতী। টলতে টলতেই দু-পা পিছিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, আর অপলকে তাকিয়ে থাকে সৌম্যর মুখের দিকে। রেশমের সুতোর মতো একটা নীলাভ শিরা দপ্ করে গলার উপর ফুটে ওঠে। মুখের কোমল রেখাগুলিও থেকে-থেকে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। কাঁপছিল অরুন্ধতী।

আর সহ্য হয় নি। দৃষ্টিতে একটা অসহিষ্ণু জ্বালা মাখিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে সৌম্য।

সেই শেষ। তারপর আর দেখাই হয় নি অরুন্ধতীর সঙ্গে। কে জানে এখন কি করছে অরুন্ধতী।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকতেই সভয়ে ছুটে আসেন ছোটকাকীমা।

—এতক্ষণ কোথায় ছিলি, সৌম্য ?

সৌম্য হেসে বলে, কেন, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ ভাবেন ছোটকাকীমা। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, বাড়ির কোনো চিঠি পেয়েছিস ?

—না তো।

ছোটকাকীমার চোখে ভয় থমথম করে।—তোর একটা টেলিগ্রাম এসেছে।

—টেলিগ্রাম !

—হ্যাঁ। আমি নিয়ে আসছি।

ফিরে আসেন ছোটকাকীমা, এবং তারপর টেলিগ্রামের কাগজটি সৌম্যর হাতে এগিয়ে দিয়ে উদ্বিগ্নভাবে বলেন, কী ব্যাপার, বুঝতে পারলি কিছু ?

ছোটকাকীমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে টেলিগ্রামের কাগজটির উপর ঝুঁকে পড়ে সৌম্য। 'Come sharp. Father seriously ill .. Maa'। সামান্য কয়েকটি কথা। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর ওই কথাগুলির অর্থ !

হতবুদ্ধির মতো সৌম্য বলে, বাবার অসুখ। মা যেতে লিখেছেন।

ছোটকাকীমা বলেন, চিন্তার কিছু নেই। তুই আজ রাত্তিরের ট্রেনেই রওনা হয়ে যা। আমি সব গোছগাছ করে দিচ্ছি।

চিন্তিতভাবে সৌম্য বলে, সেই ভালো, কাকীমা।

অপ্রত্যাশিত এবং হঠাৎ সৌম্যকে ফিরে আসতে দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন বিভাময়ী। বস্তুত, যেভাবে সৌম্য চলে গিয়েছিল, তারপর এমন কোনো কারণ ঘটে নি, যাতে ও ফিরে আসতে পারে। আরো অবাক হলেন সৌম্যর প্রশ্ন শুনে। টেলিগ্রামের খবরটা তাঁকে বড় বেশি বিব্রত করল। ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখে কিছুক্ষণ কাগজটার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, কি জানি, বাবা। এরকম অলক্ষুনে কাণ্ড কখনো দেখি নি।

স্তম্ভিত হয়েই রান্নাঘরের দিকে হেঁটে চলে যান বিভাময়ী।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কোলাহলময় বাড়িটার দিকে তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সৌম্য। যেন প্রচণ্ড একটা ছলনার ধিক্কার কোনোমতে বিস্ফোরণের আবেগ থামিয়ে সৌম্যর নিশ্বাসের মধ্যে উত্তাপ ছড়িয়ে জ্বলতে থাকে। চকিতে মনে পড়ে যায় সৌম্যর, কালকেই তো এগারোই অঘ্রান।

বিরাট ছাদ জুড়ে শামিয়ানা টাঙানো। বাড়ির সারা মন-প্রাণ ব্যস্ত করে দিয়ে একটা সাড়া জেগে উঠেছে। ছুটোছুটি করছেন কল্যাণী, আর প্রিয়-নাথবাবুর গলার হাঁক-ডাকও শোনা যাচ্ছে। বাড়িটা যে সত্যিই এগারোই অঘ্রানের উৎসবে সাজবার জন্য এরই মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে। সানাইয়ের সুর এখনো শোনা যায় নি, কিন্তু কল্পনার মধ্যেই সেইরকম একটা সুর যেন শুনতে পায় সৌম্য।

হাত-মুখ ধোয়ার চেষ্টা না করেই আস্তে আস্তে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় সৌম্য। আর বুঝতে বাকি নেই, চিন্তার মধ্যেও কোনো সন্দেহ বাধা চলে না, একটা তীব্র ছলনার নাটকের নির্জিত নায়কের বেশে ফিরে এসেছে সৌম্য। কিন্তু, কী নিষ্ঠুর এই ছলনার অভিসন্ধি! যে-ব্যথার গ্রন্থিটাকে জোর করে কাঁদিয়ে, মন থেকে ছিঁড়ে, দূরে সরিয়ে ফেলে মুক্ত হবার এত চেষ্টা করল, ঘুরে ফিরে সেই যন্ত্রণাটাকেই আবার নতুন করে আঁকড়ে ধরতে হল! এর চেয়ে বেশি কোনো বিড়ম্বনার ভয় জীবনে আর কী হতে পারে।

কিন্তু, সব কিছু ভেবে আর নিশ্চিন্ত হয়েও, এটা আর কিছুতেই বুঝতে পারে না সৌম্য, কে এমন করল, আর কেনই বা করল!

অরুন্ধতী? না, অসম্ভব। তবে! সৌম্যর চোখ-ভরা আলাটাই যেন হঠাৎ ধরতে পেরে করুণভাবে হেসে ওঠে। রুবি। রুবি ছাড়া এমন একটা নিষ্ঠুর বুদ্ধি কারুর মাথায় আসতে পারে না।

ঘরের ভিতরে টেবিলে ছড়ানো বইগুলির উপর দৃষ্টি পড়ে। কাছে গিয়ে একটা বই তুলে নিয়ে ঘরের কোণে চেয়ারে বসে আনমনা পড়তে চেষ্টা করে সৌম্য। বই নয়, যেন নিজেব মনটাকেই পাতা উলটে উলটে পড়ছে সৌম্য।

কিছুক্ষণ পরেই বিভাময়ী উঠে আসেন।

—কি বে, বসে রইলি যে! খাওয়াদাওয়া করতে হবে না?

—না, মা। এখন খিদে নেই। ট্রেনে অনেক খেয়েছিলাম।

ক্ষণিক নীরব থেকে বিভাময়ী বলেন, বেশ, তবে ও-বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। কাজকম্ম থাকতে পারে, দেখে শুনে কবগে। নইলে ওরা কিছু মনে করতে পারে।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিচে চলে যান বিভাময়ী।

সৌম্য নডল না। শরীর আব মনের কোথাও আব এক কণা সাহসের জোব অবশিষ্ট নেই। হেমন্তর হাওয়া ঢুকছিল ঘরের মধ্যে। সৌম্যর মাথাটা অলস হয়ে চেয়ারের পিঠে লুটিয়ে পড়ে।

বেশিক্ষণ নয়। মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরেই রুবি এসে বলে, লোটন-টোটনেব মুখে শুনলাম, শেষ পর্যন্ত তুমি ফিরে এসেছ।

সতর্কভাবে উঠে বসে সৌম্য।

—এই ফল্‌স্‌ টেলিগ্রাম তুমি করেছ?

রুবি ভ্রূকুটি করে।—হ্যাঁ।

—কেন?

—কেন! ঠোঁট কামড়ে ধরে রুবি।—প্রশ্ন করতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

—রুবি!

—আস্ফালন তোমার পক্ষে শোভা পায় না, ছোডদা। ছিঃ, তুমি যে এত কাপুরুষ, তা কোনোদিন ভাবতে পারি নি। একটু লজ্জাও কি করে না!

—রুবি! যেন শেষ আর্তনাদ করে টেবিলের উপর মাথা রেখে পড়ে থাকে সৌম্য।

ম্লান হেসে রুবি বলে, যাক। বেশি কিছু বলতে চাই নে। সময়ও নেই। এসেছ যখন, নিজের চোখেই অরুর দশাটা দেখ। অরুর মতো মেয়ে, তাই সহ্য করে আছে; তোমার এই কীর্তির কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দেয় নি। আমি হলে তোমার সামনেই বিষ খেয়ে মরতুম।

ঠোঁট কাঁপছিল রুবির। কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর কোনো দিকে না তাকিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ। নীরব হয়ে গিয়েছে শ্যামবাজারের গলির ভিতর এই বাড়িটা। সন্ধ্যার বাতাসে সানাইয়ের সুর আর ভেসে আসে না। কে বলবে, মাত্র কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও কান্নাহাসি আর কোলাহলে এই বাড়িটাই কেমন মুখর হয়ে ছিল। ওপাশে প্রিয়নাথদের ঘরেও আর কোনো সাড়া নেই। যেন একটা গভীর বেদনার শোকে বিহ্বল হয়ে সমস্ত বাড়িটাই নিঃশব্দে শ্বাস টানছে।

অন্ধকারের মধ্যেই চুপ করে বসে ছিল সৌম্য। দুর্বোধ্য একটা যন্ত্রণা কাঁপছে বুকে। কোথাও নেই অরুন্ধতী। এই বাড়ির ছায়ার স্পর্শটুকু পর্যন্ত পিছনে ফেলে এগারোই অঘ্রানের উৎসবটাকে বাসী করে দিয়ে চলে গিয়েছে।

বিভাময়ী উঠে এসে আস্তে আস্তে ডাকেন, সৌম্য।

ফিরে তাকায় সৌম্য। —কি, মা?

বিভাময়ী বলেন, পুরী থেকে ফেরবার পর একবারও বাড়ির বাইরে যাস নি। কি যে হয়েছে তোর।

একটু থেমে আবার বলেন, যাক, বিয়ের ঝামেলা তো সব চুকে গেল। অরুও চিরকালের মতো পর হয়ে গেল।

সৌম্য বলে, বিয়ে হয়ে গেলেই পর হয়ে যায়, মা?

ক্লান্ত নিশ্বাস ছেড়ে বিভাময়ী বলেন, তাই তো হয়।

যেন শুধু এইটুকু জানবার সাধ সৌম্যর জীবনের চরম সাধ ও স্বপ্ন হয়ে ছিল। সে-সত্যটুকু জেনে নিয়েই চুপ করে যায় সৌম্য।

বিভাময়ী বলেন, আমার আর ভালো লাগছে না, সৌম্য।

একটু আশ্চর্য হয়ে সৌম্য বলে, কেন, মা।

বিভাময়ী বলেন, কি জানি কেন! তোবা যেন দিন দিন সব কেমন হয়ে যাচ্ছিস। তুই তো আগে এমন ছিলি না, হঠাৎ এমন হয়ে গেলি কি করে!

হাঁফ ছেড়ে, বুকের ভিতর থেকে যেন একটা থমথমে কান্নার গুমট একটা নিশ্বাসের জোরে ভেঙে দেয় সৌম্য। জোর করে হেসে বলে, আবার আগের মতন হয়ে যাব। তুমি অত ভাবছ কেন।

বিভাময়ী বলেন, তোরা ভালো থাক, সুখে থাক, তাহলেই আমার আর কিছু ভাবনার থাকবে না। যাক, ভালো ছেলের মতো তুই এবার একটু বাইরে ঘুরে আয় তো।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সৌম্য বলে, হ্যাঁ, যাই।

মায়েব কথা শুনে সুবোধ ছেলেব মতো বাইরে পথে বেবিয়ে এল সৌম্য। বাড়িটা অন্ধকার। বাইবেব আলোটা যেন অকাবণে বড় বেশি জোবালো হয়ে জ্বলছে। দূর থেকে ভেসে আসছে ট্রামেব শব্দ। কোথায় একটা কুকুব একবাব চেঁচিয়ে উঠেই চুপ করে গেল। হালকা করুণ সুবে অনেকক্ষণ ধরে একটা বাঁশি বেজে চলেছে বেডিওতে।

মা-কে খুশি কববার জন্য পথে তো বেবিয়ে এল, কিন্তু, এবপব কোথায়? কোনো গন্তব্যেব ঠিকানাই তো মনে পড়ছে না। অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে পথের উপব দাঁড়িয়ে থাকে সৌম্য। তাব পরেই হঠাৎ মনে পড়ে জয়ন্তীকে।

হাঁটতে হাঁটতে বড রাস্তায় পড়বার মুখে পপুলার কেবি'নর সামনে এসে ইচ্ছে কবেই একমুহূর্ত থেমে পডল সৌম্য। যা কখনো হয় নি, আজ তাই হল। দেখল, প্রায় শূন্য পপুলার কেবিনের ভিতরে একটা চেয়ারে বসে অন্যমনস্কভাবে সিগাবেট টানছে সুনীল। দেখেই চোখ নামিয়ে নিল সৌম্য। অরুন্ধতীর জীবনের ঘৃণাটা যাকে দেখলে সবচেয়ে বেশি উথলে উঠত, তাকেই যে কোনোদিন আবার অরুন্ধতীর ছায়ার সান্নিধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে, কোনোদিন তা ভাবতে পারে নি। আজ ভাবতে বিস্ময় লাগে সৌম্যর, সেই অসম্ভব ব্যাপারটাকেই মিথ্যে করে দিয়ে কি করে প্রিয়নাথবাবুর বাড়ির মানুষের মতো একটা আপন জন হয়ে গেল সুনীল!

পুরী থেকে ফিরে আসা অবধি সুনীলেব মুখটা বার বার চোখে পড়েছে সৌম্যর। এই উৎসবের প্রত্যেকটি ছুটোছুটি আর ব্যস্ততার মধ্যে যেন

নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে সুনীল! এই তো, মাত্র কিছুক্ষণ আগেই স্বামীর সঙ্গে সংসার সাজাতে চলে গেল অরুন্ধতী। অরুন্ধতী চলে যাবার সময়ও সুনীলকে বললেন প্রিয়নাথ, তুমিও সঙ্গে সঙ্গেই থেক, বাবা। একেবারে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই এস।

ট্যাক্সিতে, ড্রাইভারের পাশের সিটে বসতে বসতে সুনীল বলে, আপনি চিন্তা করবেন না, কাকাবাবু। আমি তো সঙ্গেই আছি।

সুনীলের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্টার্ট নিয়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে ট্যাক্সি।

আর দেখা যায় নি · দেখবারও কিছু ছিল না। দু-হাতে মুখ ঢেকে ঘরে ফিরে এসে, শরীরের সমস্ত সংযম ভেঙে দিয়ে বিছানার উপরেই এলিয়ে পড়েছে সৌম্য।

আর কোনো ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, উদ্বেগ নেই। এত বড় একটা আশার স্বপ্ন, সব গর্ব ব্যর্থ হয়ে গেল। সৌম্যর জীবনে একটা আশার কবিতা হঠাৎ ভাষা হারিয়ে মিলের আগেই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। কেউ জানবে না, কেউ বুঝবেও না, এখন থেকে অরুন্ধতী শুধু একটা গল্প হয়ে স্মৃতির আড়ালে পড়ে থাকবে।

বাসের মধ্যে বসে পথের শোভা দেখতে দেখতে সৌম্যর জীবনের সেই গল্পটাই যেন সহসা মুখর হয়ে ওঠে। চিন্তাটাও একটু অন্যরকম জ্বালাময় হয়ে চোখের উপর ভাসতে থাকে। কোলাহলময় পথের ধোঁয়াটে কুহেলিকার দিকে তাকিয়ে একটা প্রশ্নের সঙ্গে যেন মনে মনে সংগ্রাম করে সৌম্য। কি করে এত আপন জন হয়ে গেল সুনীল?

হাজরা পার্কের কাছে এসে বাস থেকে নামল সৌম্য। কে জানে, এখন জয়ন্তী বাড়ি থাকবে কিনা। হৃদয়ের নাগাল থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে অরুন্ধতী। কে জানে, এখন কি করছে অরুন্ধতী!

ভাবতে ভাবতে জয়ন্তীদের বাড়ি এসে গেল।

ফটক পেরিয়ে বারান্দা পর্যন্ত গিয়ে একমুহূর্ত ইতস্তত করে সৌম্য। ইচ্ছা হয় ফিরে যেতে। জয়ন্তীর অনেক সম্মানের আহ্বান হেলায় উপেক্ষা করে কতদিন শূন্যহাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। জয়ন্তীর অভিমানটাকেও কোনোদিন অভিমান বলে বুঝতে চেষ্টা করে নি সৌম্য। আর, আশ্চর্য, মনেই হয় নি কোনোদিন, জয়ন্তীর জীবনেও একটা সুখের কিংবা দুঃখের ইতিহাস থাকতে

পারে! বেশ বড়লোকের ঘরের মেয়ে জয়ন্তী, দেখতেও খুব সুন্দর, এবং মনটা যেন বড় বেশি সুন্দর, জিজ্ঞাসা না করেও অনায়াসে এইটুকু জানতে পারা যায়। এবং সেইটুকু মাত্র জেনে, আর সব জানার বাসনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েই যেন সব দায় ফুরিয়ে গিয়েছে সৌম্যর। জয়ন্তীর জন্য তার মনের পাতায় ভুল করেও কোনো মুহূর্তে এক ফোঁটা মায়ার শিশির স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে নি তো!

কিন্তু আজ একেবারে নিঃস্ব হয়ে, জয়ন্তীরই বাড়ির দরজায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এইসব ভেবে ভেবে মন খারাপ করারও তো কোনো অর্থ হয় না। জয়ন্তীর সঙ্গে কোনো নিবিড় সম্পর্ক নেই; এক ক্লাশের এবং মাত্র কয়েকদিনের আলাপের সঙ্গিনী জয়ন্তী। সুতরাং, অতি কোমল, দুর্বল ও মেরুদণ্ডহীন একটা পৌরুষের জ্বালা নিয়ে জয়ন্তীর কাছে ছুটে আসাটাও তো নিতান্ত অর্থহীন!

হঠাৎ যেন নিজের মনের একটা বোকামির ভুল ধরতে পেরে, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ধরে নেমে ফটকের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায় সৌম্য।

কিন্তু, যেতে পারে না সৌম্য। কি করে যেন খবর পেয়ে গিয়েছে জয়ন্তী; এবং খবর পেয়েই ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে এসেছে।

ব্যাকুল স্বরে জয়ন্তী ডাকে, ওকি, যাচ্ছ কোথায়।

সৌম্য বলে, চলে যাচ্ছি।

প্রশ্ন করে জয়ন্তী, কোথায়?

সূক্ষ্ম হেসে সৌম্য বলে, তা তো জানি না।

এগিয়ে আসে জয়ন্তী, এবং সৌম্যর প্রায় বুকের কাছে দাঁড়িয়ে বলে, তা হয় না, সৌম্য। দরজায় এসে ফিরে যেতে নেই।

তীক্ষ্ণ চোখে ক-পলক জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে থাকে সৌম্য। কি যেন একটা রয়েছে জয়ন্তীর চোখে, ফিরে যাওয়া যায় না। অগত্যা অনুসরণ করতে হয় জয়ন্তীকে।

নিজের ঘরে ঢুকে, বিছানার উপরেই সৌম্যকে বসতে দিয়ে মৃদু হেসে জয়ন্তী বলে, এমন সময় তুমি এলে, যখন একেবারে একলা বসে ছটফট করছি। তিনদিন হল, বাপি দেওঘরে চলে গিয়েছেন। বন্ধুরাও তো কেউই আর আসে না। তাই বসে বসে ভাবছিলুম, তোমার কি হল!

চোখ না তুলেই ক্লিষ্ট হাসে সৌম্য।

প্রশ্ন করে জয়ন্তী, ছিলে কোথায় এতদিন ?

সাড়া দেয় না সৌম্য, ইতস্তত করে, একটু ভয়ও যেন পায়। জয়ন্তী যেন তার মনের সবচেয়ে গোপন কক্ষের নিভৃত কপাটে টোকা দিয়েছে। এখন আব কিছুই লুকনো যায় না। সব বাধাই তুচ্ছ হয়ে যাবে।

সব কথাই বলতে হয় জয়ন্তীকে। শুনে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে স্থির চোখে সৌম্যর মুখের দিকে তাকায় জয়ন্তী।

সৌম্য বলে, আমার মাথার ঠিক নেই, জয়ন্তী। বাড়িতে আমি দু-দণ্ড থাকতে পারছি না। সব যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে!

জয়ন্তী বলে, অসহ্য হলেও সহ্য তোমাকে করতে হবে। যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে অনুশোচনা করে কোনো লাভ নেই। তাতে তোমার কোনো ভালো হবে না, অরুন্ধতীরও হবে না।

নিরুত্তরভাবেই চোখ নিচু করে বসে থাকে সৌম্য।

জয়ন্তী বলে, একটা পরীক্ষা তো শেষ হল। কিন্তু, ভুলে যেও না, নতুন পরীক্ষা তোমার সামনে। মনে থাকে যেন, এবারও তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে। ফাইন্যাল পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই।

সৌম্যব মনেব আবেগে একটা স্থবিব কুয়াশার অপবিচ্ছন্ন আঁধার যেন একেবারে পবিষ্কাব হয়ে যায়। উঠতে উঠতে সৌম্য বলে, তোমাব কথা মনে থাকবে, জয়ন্তী।

জয়ন্তী হেসে বলে, এখনই যেতে হবে না। একটু বস। আমি আসছি।

বাড়িটা আবার আগেকার মতো হয়ে গিয়েছে। ঠিক তখনকার মতন, যখন প্রিয়নাথবাবুরা এ-বাড়িতে আসেন নি। এখন আবার দুপুরটা তেমন ঝিমঝিম করে ; পেয়ারা গাছের ডালে বসে বিশ্রী ডাক ছেড়ে গলা ফাটায় কাক ; কিন্তু কেউ তাড়াবার চেষ্টা করে না। দশটা বাজবার আগেই ব্যস্ত হয়ে অফিসে বেরিয়ে যান বিনয়বাবু। শান্তভাবে একটা ক্লান্ত ইচ্ছার মেয়াদ কোনোবকমে টেনে টেনে সংসারের কাজগুলো একের পর এক সেরে রাখেন বিভাময়ী। বিনয়বাবু চলে যাবার পর আস্তে আস্তে দোতলার ঘব থেকে নিচে নেমে

আসে সৌম্য ; স্নান করে, খায়। তারপর কোনো কথা না বলেই কাগজের ফাইল হাতে বেরিয়ে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঠিক আগের দিনের মতোই গল্পের বইয়ের পাতা উলটে যান বিভাময়ী।

পার্টিশনের মাঝখানের দরজাটা তবু খোলাই থাকে।

দোতলার জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়ে যায় সৌম্যর। দৃষ্টিটা যেন কাঁদতে গিয়েই আবার হঠাৎ সামলে নিয়ে হেসে ফেলে। তিন দিন আগে লোটন-টোটনের একটা ছোট রবারের বল ওই দরজার কপাটের পিছনে কি করে যেন আটকে গিয়েছিল। বলটা বের করতে গিয়ে একটি কপাট সেই যে ঠেলে বন্ধ করে দিয়েছিল, তারপর কেউ আর তা খুলে দেয় নি। কারুর হয়তো চোখেই পড়ে নি। এও হতে পারে, ওই পথ দিয়ে এই তিন দিনের মধ্যে আর কেউ যাওয়া-আসাও করে নি।

পিঠ-ফেবানো কপাটের গায়ে একটা কাঁচা-হাতে-আঁকা হিজিবিজির ছবি চোখে পড়ে। একটি মেয়ের ছবি। ছবিব নিচে কাঁচা অক্ষরে লেখা ছোট্ট দুটি কথাও বেশ পড়া যায় ;—দিদি। দিদি, অর্থাৎ অরুন্ধতী, লোটন-টোটনেব দিদি। অনেকদিন আগে লোটন-টোটনকে দুটো চকখড়ি দিয়েছিল সৌম্য। খুব খুশি হয়েছিল লোটন-টোটন , এবং বড় বেশি খুশি হয়ে একটা সামান্য অপেক্ষার তর সহ্য কবতেও রাজী হয় নি।

একটু হাসে সৌম্য। যে-কপাটটা বন্ধ হয় নি, তার পিঠেও তো একটি মুখের ছবি রয়েছে ; আর, সেই ছবির নিচেও একটা নামের পবিচয় লেখা রয়েছে ;—সৌম্যদা। দিদি আর সৌম্যদা ! ভেবে আশ্চর্য হতে হয়, সেই মুহূর্তে আর কারুব ছবি আঁকবাব কথা কেন মনে হয় নি লোটন-টোটনের ! প্রিয়নাথ, কল্যাণী আর চারুবালা, কিংবা বিনয়বাবু অথবা বিভাময়ীর ছবিও অনায়াসে আঁকতে পারত ! ওই ছবি দুটি যেন একটা গোপন রহস্যের কাহিনী আরো অনেকের চোখে স্বচ্ছ করে দিয়েছে।

অরুন্ধতীর চোখে পড়েছিল ওই ছবি। অনেকক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, আমি মুছে দেব। কেউ দেখলে কি মনে করবে বল তো !

হেসে হেসেই বলেছিল সৌম্য, ছেলেমানুষ যদি এঁকেই থাকে, তাতে হয়েছে কী !

অরুন্ধতী বলেছিল, ছেলেমানুষ আঁকলেও ওর মানেটা খুব ছেলেমানুষী নয়।

—মানেটা কী, বল আমাকে ? সৌম্য হাসছিল।

অরুন্ধতীর সেই স্পষ্ট ঘোষণা এরপর আর থাকে নি। বুক কেঁপেছে, নিশ্বাস কেঁপেছে। চোখ নামিয়ে নিয়ে অরুন্ধতী বলেছিল, জানি না কী মানে। আমারটা অন্তত মুছে দেব।

হাতের মুঠি শিথিল হয়েছে সৌম্যর। অন্যমনস্কভাবেই বলেছে, মুছতে হলে আমারটাই মুছে দিও।

অর্থহীন একটা কথাকে ভীষণভাবে আঁকড়ে ধরবার লোভেই যেন সৌম্যর হাতটাকে খিমচে ধরে এবং প্রায় বুকের কাছে সরে এসে ফিসফিস করেছিল অরুন্ধতী, কারুরটা মুছেই কাজ নেই। যে দেখবে দেখুক, যা খুশি ভাবুক। মিথ্যে তো নয়। না হয় সত্যি কথাটাই ভাববে।

তারপর থেকে অনেক ঝড, বৃষ্টি আব হাওয়াব দাপট সহ্য কবেও অমলিন বয়েছে ওই ছবি আব ছবিব পবিচয়। কিন্তু এখন, এখন ওই ছবি দুটি মুছে দিলেই হয়। সেদিনের একটা ভুল ভাষণের ঠাট্টা হয়েই যেন হাসছে ওই ছবি।

চোখ ফিবিয়ে নিয়ে আবাব বইয়ের পাতা ওলটায় সৌম্য। প্রাণেব সেই দুঃসহ জ্বালা কবেই যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। মনটা কেমন অগোছাল, বিক্ষিপ্ত। আজ বইয়েব পাতা ওলটাতে ওলটাতে সৌম্যব মনে হয়, তাব জীবনেব সব আক্ষেপ মিটে গিয়েছে। কাঁটাগুলিও আব তেমন বেঁধে না। দিন কেটে যাচ্ছে। বেশ ভালোভাবেই দিন চলে যাচ্ছে। কে জানে, এ তাব পবাজয়েবই ফল কিনা। আজ এই এক মাসেব মধ্যে পৃথিবীব কোথাও এক মুহূর্তেব জন্যও অরুন্ধতীকে দেখতে পায় নি সৌম্য। কানেব পাশে অরুন্ধতীব নামটাও কোথাও উচ্চাবিত হতে শোনে নি। সত্যি সত্যিই যেন আজ গল্প হয়ে গিয়েছে অরুন্ধতী।

বিয়ের পর আরো একদিন এই বাড়িতে এসেছিল অরুন্ধতী। অষ্টমঙ্গলার দিন। সেই দিনটিব আগেব দিনই স্মবণ কবিয়ে দিয়েছিলেন বিভাময়ী, কালকেই ফিরে আসবে অরুন্ধতী, থেকেও যাবে কিছুদিন।

কথাটা শোনবার পর থেকেই সৌম্যব চোখ থেকে ঘুম চলে গেল। একটা গভীব অপরাধের ভয় বুকের মাঝে সর্বদা থিবথির কবে। এই পরীক্ষা যে সেই পরীক্ষার চেয়ে আরো কঠিন। অরুন্ধতীব শাদা, শূন্য আর নিরক্ত মুখের চেহারা বরং দেখা যায়; কোনোরকমে সহ্যও করা যায়। কিন্তু, সিঁথির

ওই উজ্জ্বল রক্তিমা যে একেবারে দুঃসহ! কে জানে, একটা ঘৃণাব চাহনি নিক্ষেপ করেই হয়তো সরে যাবে অরুন্ধতী! কিংবা, হয়তো স্থিব চোখ দুটিকে অপলক করে দেখবে; এবং তাবপর পাতলা ঠোঁটের কোণে একটুকু মরা, নির্জীব বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলবে। সেই হাসি যেন আগে থেকেই সৌম্যর বুকে জ্বালা হয়ে জ্বলতে থাকে।

সকালের প্রতীক্ষা সন্ধ্যায় শেষ হয়। তারপর আবার বাড়ির সামনে ট্যাক্সি এসে থামে। শব্দ শুনেই অধৈর্য সৌম্য বেরিয়ে আসে বাইরে। প্রথম যে নামল, সে সুনীল। অরুন্ধতীর স্বামী বিভাসও গাড়ি থেকে বেবিয়ে এল। দুজনে নেমে যাবার পর মন্থর পায়ে ধীরে ধীবে নামল অরুন্ধতী; এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে যেন সেই পুরনো আর পরিচিত বাড়িটাকেই নতুন করে চিনতে চেষ্টা করল। উপবে তাকাতেই দেখা হল সৌম্যর সঙ্গে। কিন্তু, সৌম্যর চিন্তাটাকে বিস্মিত করে দেবাব জন্যেই যেন চোখ নামাতে ভুলে যায় অরুন্ধতী।

দৃষ্টির মধ্যে একটা উদাস হাওয়া ছটফট করে সৌম্যব। মনে পড়ে সেই প্রথম দিনটিব কথা, যেদিন প্রিয়নাথবাবুরা এই বাড়িতে প্রথম এলেন। ট্যাক্সি থেকে একে একে নামল সকলে। অরুন্ধতীব ভঙ্গীটা ঠিক সেই রকমই ধীব, মন্থব ও শান্ত আছে, শুধু চোখের চাহনিটুকুই যেন লাজুক হয়ে লুকিয়ে পডতে ভুলে গিয়েছে! উদাস হাওয়ার জ্বালায় চোখ দুটিকে ধাঁধিয়ে নিয়ে ফিরে আসে সৌম্য; এবং চেয়ারে বসে চুপ করে ভাবতে থাকে।

একটু পরেই অরুন্ধতী এল।

লাল বেনারসি আব সোনার গয়না। সিঁথির মাঝখানে সূক্ষ্ম বেখাটা পলাশেব পাপড়ির মতো জ্বলছে। বিষণ্ণ মধুব একটা হাসির কলি যেন কঠিন হয়ে বেঁকে গিয়েছে ঠোঁটের কোণে। গলা শুকিয়ে আসছিল সৌম্যর।

বিছানার উপরেই খুব সহজ একটা ভঙ্গী করে বসে পড়ল অরুন্ধতী।

—অনেকদিন পবে দেখা হল। কেমন আছ, সৌম্যদা?

সৌম্য হাসল।—ভালো। তুমি?

সাড়া না দিয়ে জানলার বাইরে বহুদূবের একটা নারকেল গাছের অস্পষ্ট কায়ার দিকে তাকিয়ে থাকল অরুন্ধতী।

অস্ফুটে বলল সৌম্য, কই, জবাব পেলুম না!

—সত্যি জানতে চাও!

—সত্যি নয়।

সেলোফেন কাগজের মতো চকচক করে অরুন্ধতীর চোখ দুটি। নিশ্বাস দ্রুত, কম্পিত।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল অরুন্ধতী।

—যাই। কাজ আছে।

—এরই মধ্যে।

—হ্যাঁ। একটু মার্কেটে যাব। সুনীল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুনীল!

বিস্ময়ের চিৎকারটা যেন রুদ্ধ হয়ে আর ধ্বনি হারিয়ে সৌম্যর গলার কাছে কাঁপতে থাকে। অরুন্ধতীর পায়ের শব্দও তখন সন্ধ্যার বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে।

তারও একটু পরে বিভাসের সঙ্গে পরিচয় হয়। ফরসা, সুন্দর, বেশ লম্বা চওড়া পৌরুষের চেহারা বিভাসের। রূপ আছে, গুণও রয়েছে। দু-চোখ ভরা শ্রদ্ধা ও বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে সৌম্য। সে-দৃষ্টিতে ঈষৎ জ্বালাও বুঝি ছিল।

তবু, বিভাসকে দেখলে হিংসা হয় না, বরং শ্রদ্ধা হয়। সেদিন বিভাস চলে যাবার পরও সৌম্যর মনে এই শ্রদ্ধার বিস্ময় ধূপের সুরভির মতো একটু একটু করে পুড়তে থাকে। যাক, তাহলে হয়তো সুখী হয়েছে অরুন্ধতী। আর কিছু না হক চিরকালের মতো একটা মমতার স্বপ্ন অরুন্ধতীর জীবনে হাসতে থাকবে। এর বেশি কোনো চিন্তার ভয় সৌম্যর জীবনে আর রইল না। বিভাসের ছায়ার স্নেহে দিনে দিনে অপূর্ণতার আক্ষেপ শান্ত হবে, বেদনাগুলিও অভিযোগ ভুলে গিয়ে পূর্ণতায় ঝলমল করবে। এবং তারই মাঝে হয়তো সৌম্য নামে একটা বাজে গল্পকে মাঝে মাঝে মনে পড়বে অরুন্ধতীর।

অনেকদিন পরে এইসব ভেবে আর ভাবনার নিশ্বাস ঝরিয়ে মুক্ত হতে চেয়েছিল সৌম্য।

এইসব দিন-রাত্রি কবে যেন হারিয়ে গিয়েছে। ম্লান অন্ধকারে কতগুলি মুমূর্ষু আলোর রেখা ফুটে উঠেছিল, কয়েক মুহূর্তের নিশ্বাস নেবার জন্য। তারপর আবার অন্ধকার ; কালো, সবুজ, থিকথিকে অন্ধকার। এবং স্বাভাবিক আলো। সময় কারুর জন্য থেমে থাকে নি ; অপেক্ষা করবার প্রয়োজন বোধ করে নি।

সৌম্য জয়ন্তীকে বলেছিল, জয়ন্তী, কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হয়, কোথায় কোন অদৃশ্য আকাশে একটা ঝড়ের মাতন শুরু হয়েছিল, যাব প্রচণ্ড গর্জন আমি শুনতে পাই নি, কিন্তু কি করে যেন একটা ছায়ার দাগ মনে আঁচড় কেটে গিয়েছে। সেই চিহ্ন আমার কোনো ক্ষতি কবে না, ববং তার অস্তিত্ব আমি ভালবাসি। তবু আমি চাই সেই চিহ্নকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিতে। কিন্তু পাবি না। মনে হয়, গোপন অগোচবেব কোন এক শক্তি সব সময় আমাকে বাধা দিচ্ছে।

শান্তভাবে শুনে এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জয়ন্তী বলেছিল, যা হঠাৎ আসে, তা আবাব হঠাৎ চলে যায় না, সৌম্য। মন থেকে তাকে সরিয়ে দিতে সময় লাগে।· পেয়ে হাবানো আর সম্পূর্ণ করে পাওয়া— দুইয়ের ব্যবধান খুব কম তো নয়।

আজ এতদিন পরে, নির্জন ছাদেব অন্ধকাবে একেবারে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে জয়ন্তীর কথাগুলি নতুন করে ভাবছিল সৌম্য।

মাত্র তিনটি বছর! এব মধ্যেই কত ওলট-পালট হয়ে গেল!

পার্টিশনের মাঝখানের সেই দরজাটা আজ সকালে নিজেই টেনে বন্ধ করে দিয়েছেন বিনয়বাবু। ওটা অমন হাঁ-হাঁ শূন্য করে খুলে রাখার আর কোনো অর্থ হয় না। নতুন ভাড়াটে যদি কেউ আসে, তাহলে আবাব খুলে দেওয়া যাবে। ওই দরজাটি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা চরম উদ্‌ভ্রান্তির নাটকের শেষ অঙ্কের উপর যবনিকা পড়ে গিয়েছে যেন।

দরজাটা বন্ধ করবার সময় বিভাময়ীকে ডেকে বলেছিলেন বিনয়বাবু, ধুলো জমে জমে কপাটের রঙটাও যেন বদলে গেছে!

বিভাময়ী কোনো সাড়া দেবার আগেই কপাট দুটি বন্ধ করে দিয়ে এবং কোনোদিকে আর কিছু লক্ষ্য না করেই দু বালতি জল এনে ঢেলে দিয়েছিলেন বিনয়বাবু। মুহূর্তের জন্য চমকে উঠেছিল সৌম্য ; বুকের ভিতর নিশ্বাসটাই যেন ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল। ধুলোর সঙ্গে সঙ্গে কপাটের বুকে সেই ছবি দুটি আর তাদের পরিচয়ের ইতিহাসও নিদাগ হয়ে ধুয়ে যাবে। ভালোই হবে। ওই ছবি দুটি আর কোনোদিন চোখে পড়বে না ; মনেও পড়বে না।

কিন্তু কলেজ থেকে ফিরে এসে বিস্মিত হয়ে সৌম্য দেখেছে, খড়ির দাগগুলি মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, বরং ধুলোর আবরণ খসিয়ে উজ্জ্বল রৌদ্রে আরো ঝলমলে হয়ে ফুটে উঠেছে !

তিনদিন হল এই বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে পাটনা চলে গিয়েছেন প্রিয়নাথবাবু। তাঁর ছোট ভাই সুশান্ত আমেরিকা থেকে ভালো একটা শিক্ষার ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছে এবং ভারত সরকারের অধীনে বেশ ভালো মাইনের একটা সার্ভিসও পেয়ে গিয়েছে। নিজেই এসেছিল সুশান্ত, আর, একরকম ধবে-বেঁধে জোর করেই সকলকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। মা-বাবা মারা যাবার পর প্রিয়নাথই তাঁর এই ছোট ভাইটিকে বুকে পিঠে কবে মানুষ কবেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন। স্নেহের সেই ঋণ আজ এমনি করেই শোধ দিতে চায় সুশান্ত।

কলকাতায় যে-অফিসে কাজ কবতেন প্রিয়নাথ, সেই স্টুয়ার্ট এ্যাণ্ড জন্‌সন্ লিমিটেডের অফিসে আবো দুটি বছবেব সার্ভিস পাওনা ছিল তাঁব। সুশান্তব মিনতি তুচ্ছ কবতে না পেবে, ম্যানেজিং ডিবেক্টবের সঙ্গে দেখা কবে ওই অফিসেবই পাটনা ব্রাঞ্চে বদলি করে নিয়েছেন। মেয়ের বিয়ে দিয়ে এখন একেবারে নিশ্চিন্ত। আর কোনো ভাবনা নেই, উপদ্রবও নেই। কলকাতাব এই ট্রাম-বাস, ভিড আর কোলাহল এই বুড়ো বয়সে আর পছন্দ হয় না প্রিয়নাথের। সুতরাং, সব মায়াব বাঁধন ছিন্ন কবে স্বস্তিব হাঁফ ছেড়ে চলে গিয়েছেন তিনি।

পার্টিশনের ওপাশে সব কোলাহল এখন নীরব। কলেজ থেকে ফিরে আজ দুপুরে গা-ছমছম করে উঠেছিল সৌম্যব। সমস্ত বাড়িটা যেন ভুতুড়ে বাড়ির মতো নিঝুম, নিঃশব্দ। উঠনে একটা পচা ইঁদুরের কাটা-ছেঁড়া দেহকে মাঝখানে রেখে দুটো চিল বসে বসে পাহারা দিচ্ছিল। প্রথমে দেখে

চমকে উঠেছিল সৌম্য। ভয় পেয়ে চিল দুটো উড়ে যাবার পর, আস্তে আস্তে দোতলায় ফিরে সেই যে নিজের ঘরে ঢুকেছে, তারপর আর নিচে নামে নি।

মাত্র তিনটি বছর! এখন আর রুটিন বেঁধে ইউনিভার্সিটির পড়া তৈরি করার ব্যস্ততা নেই। জয়ন্তীর মনের সেই শুভেচ্ছার স্বপ্নটাই সত্যি হয়ে গিয়েছে। এম. এ. পরীক্ষাতেও ফার্স্ট হয়েছে সৌম্য; আর পাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা লেক্‌চারারের চাকরিও পেয়ে গিয়েছে। আরো বেশি পড়াশুনার জন্য স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে যাবার সুযোগটাও হয়তো কপালে জুটে যেতে পাবে। বিভাময়ী আর বিনয়বাবু এখন খুশি। এমন কি, অনেকদিন আগেকাব সেই মলিনা মিত্রও একদিন এসে, ভয়ে ভয়ে আর খুব সঙ্কোচে একটা স্তুতি জানিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে।

জয়ন্তীও পাশ করে আবাব নতুন সাবজেক্টে এম এ দেবাব জন্য তৈরি হচ্ছে।

বোঝা যায়, আর কোথাও কোনো আক্ষেপ জমে নেই। এব চেয়ে সহজ ও সুন্দব সমাধান জীবনে আর কি আশা করা যায়!

কথায় কথায় একদিন বিভাময়ী বলেছিলেন, আমার জীবনে আব একটা সাধ বাকি আছে, সৌম্য।

বিভাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন কবে সৌম্য, কী সাধ, মা! তীর্থে যাবে?

ঠোঁট টিপে হাসেন বিভাময়ী, এবং বলেন, হ্যাঁ, তীর্থে তো যাবই। কিন্তু তাবও আগের একটা সাধ।

বিভাময়ীর ঠোঁটের ওই চাপা হাসিটার অর্থ বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে সৌম্য।

বিভাময়ী বলেন, আমি এবার একটু খোঁজাখুঁজি করি, কী বল? একা একা আর কদ্দিন থাকব!

বিভাময়ীর ইচ্ছাটাকে খুশি করতে পারলে সৌম্যও যেন ধন্য হয়ে যেত। কিন্তু, বিভাময়ীর কথা শুনে সামান্য চঞ্চল না হয়ে, অদ্ভুত এক দুর্বলতায় ভেঙে পড়ে সৌম্যর নিশ্বাসগুলি। সৌম্য বলে, পড়া তো এখনো শেষ হয় নি, মা। তাছাড়া, ফরেন্ স্কলারশিপ্‌টা যদি জোগাড় করতে পারি যাক, ওসব এখন ভেব না, মা।

এরপর আর কোনো কথা বলেন নি বিভাময়ী। সৌম্যর মুখের দিকে একটা অনুযোগের দৃষ্টি তুলে তাকাতেও যেন ভুলে গিয়েছেন। মনে হয় সৌম্যর, বিভাময়ী যেন তার মনের সত্যি রূপটাকে চিনে ফেলেছেন; এবং মুখের এই সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত মিথ্যাটাকে অনায়াসে বুঝে নিতে এতটুকু ভুল করেন নি।

কোথা থেকে এক ঝলক শান্ত হাওয়া ছুটে এল; দুরন্ত আগ্রহে মাথার চুলগুলিকে উড়িয়ে এলোমেলো করে দিল। সময়টা এখন ফাল্গুন, বাতাসে মৃদু শীত। দূর থেকে একটা পরিচিত গানের সুর ভেসে আসছিল। চোখ বন্ধ করে একবার গানের কথাগুলি অনুসরণ করবার চেষ্টা করে সৌম্য। তারপর আবার চোখ খুলে আকাশে তাকায়। স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় আকাশটা কেমন নীল হয়ে উঠেছে। পার্টিশনের ওপাশে ছাদের জমিতে এরিয়েলের দীর্ঘ ছায়া। নিঃসঙ্গ পরিবেশে ওই ছায়া-শরীর কোন অনির্বচনীয় সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে কে জানে।

সৌম্য ভাবছিল।

প্রিয়নাথবাবুরা চলে যাবার সময় স্টেশনে তুলে দিতে গিয়েছিল সৌম্য। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাই বলেছিলেন প্রিয়নাথ, যেন শুনেও শুনতে পায় নি সৌম্য। ও তখন অন্য কথা ভাবছিল। গার্ডের হাতের সবুজ বাতিটা দুলে ওঠবার সময় সৌম্যর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে প্রিয়নাথ বলেছিলেন, অরুকে আমরা পর করে দিয়েছি, সৌম্য। কিন্তু তোমরা যেন দিও না। এখন থেকে ওর আপন জন বলতে তোমরাই রইলে। অরুকে দেখো-খোঁজখবর নিও।

প্রিয়নাথের কথা শেষ হবার আগেই তীক্ষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল।

বেশিদিন নয়, মাত্র তিনদিন আগেকার ঘটনা। আনমনা হাসে সৌম্য। সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবার পরও একটা নতুন সম্পর্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন প্রিয়নাথবাবু। কিন্তু, জানেন না প্রিয়নাথ, কী মিথ্যে একটা আশ্বাস নিয়ে চলে গেলেন তিনি।

মনে হয় সৌম্যর, অরুন্ধতী যেন তার সমস্ত ভালবাসার গর্বটাকেই মিথ্যে করে দিয়েছে। বেশ রঙচঙে, প্রাণবন্ত আর সুন্দর একটি ছবির

মতো সংসার-ই আশা করেছিল সৌম্য। কিন্তু, আজ মনে হয়, ধারণার মধ্যে কোথায় যেন একটা ভুল থেকে গিয়েছিল।

অরুন্ধতীকে আর বোঝা যায় না, বিভাসকেও না। দুজনের মিলিত রূপটাকেও কোথাও খুঁজে পায় না সৌম্য। এই তো, বিয়ের পর এর মধ্যেই অরুন্ধতীর সংসার দেখতে গিয়ে একটা তীব্র হতাশার বেদনা নিয়েই ফিরে এসেছে সৌম্য। আর, ফিরে আসতে আসতে প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে, কোথায় যেন একটা ছন্দপতন ঘটে গিয়েছে! এই বাজে ছবির রূপ দেখতে বার বার ছুটে যেতে ক্লান্তি আসে, ভয়ও হয়।

আকাশে তাকিয়ে সৌম্য ভাবে, সেই ভয় আঁর ক্লান্তি আরো একবার অনুভব করবার জন্য কালই যেতে হবে। কয়েকবার গিয়ে ঠিকানাটাও যে এখন একেবারে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

ফার্ন রোডে বিভাসের বাড়ির সম্মুখে গিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সৌম্য। বন্ধ দরজার ওপাশে কোনোরকম সাড়াশব্দ বা কর্ম-কোলাহল শোনা যায় না। যে-বাড়িতে মানুষ থাকে, সে-বাড়ি তো এমন নিশ্চুপ হয় না!

সৌম্য একটু আশ্চর্য হল।

প্রথম যেদিন এ-বাড়িতে এসেছিল সৌম্য, সেদিন অরুন্ধতীর কাছ থেকে বেশ একটা খুশির অভ্যর্থনা পেয়েছিল। সেদিন খুব যত্ন করেছিল অরুন্ধতী, এবং বিভাসও অনেকক্ষণ ধরে সামনে বসে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা চালিয়ে বেশ জমিয়ে রেখেছিল। দুপুর ফুরিয়ে কখন বিকেল হয়েছে, এবং বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা, কিছুই বুঝতে পারে নি সৌম্য। ফেরবার সময় আবার বেশি দিন দেরি না করে আসবার অনুরোধ জানিয়েছিল অরুন্ধতী। আর, পাশাপাশি হেঁটে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, বাস না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল বিভাস।

কিন্তু, দ্বিতীয় দিন তা হয় নি। বরং, একটা ভয়ঙ্কর ভুলের চক্রান্তে পড়েই যেন হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে সৌম্য। হাসিমুখে দরজা খুলে দিয়ে সেদিনও কপাটের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল অরুন্ধতী। কিন্তু, বুঝতে দেরি

হয় নি সৌম্যর, অরুন্ধতীর ঠোঁটের ওই হাসিটা একটা ফাঁকা, নিষ্প্রাণ আর অসার হাসি। এমন কি, বিভাসের মতো লোক, যার মুখ কখনো কালো হয় না বলেই জানা ছিল সৌম্যর, সেও যেন মুখের উপর একটা যন্ত্রণার ছায়া মাখিয়ে, একেবারে জানলার বাইরে আকাশের একখণ্ড কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ ও গম্ভীর হয়ে বসে ছিল। তারপর, ফেরবার সময় যেন ইচ্ছে করেই একটা পুরনো কথাকে নতুন করে বলতে ভুলে গিয়েছে অরুন্ধতী; এবং বিভাস যদিও হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তা পর্যন্ত এসেছিল, তবু নমস্কারের জন্য হাত দুটো তোলবার সময় তেমন জোর পায় নি।

আজ তৃতীয় দিন।

দাঁড়িয়ে থেকে, দরজায় কান পেতে, ভিতরের কোনো সাড়া শুনতে না পেয়ে, বিব্রত উদ্বেগে শেষে কলিংবেল টিপে ধরে সৌম্য। এবং সেই মুহূর্তে দরজা খুলে দিয়ে ভিতর থেকে যে-মূর্তির দুটি চোখ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে, সে অরুন্ধতী নয়। বিভাস।

শীর্ণ ও শুকনো বিভাসের মুখের দিকে তাকালে কেমন সন্দেহ হয়। ঠোঁটের ভাঁজে সূক্ষ্ম একটা হাসি ফুটে রয়েছে। বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকে সৌম্য।

অনুযোগ করেই বিভাস বলে, একেবারে ভুলে গিয়েছেন দেখছি। সেই যে সেবার চলে গেলেন, তারপর আর এলেনই না।

সৌম্য বলে, কী ব্যাপার বলুন তো! বাড়ি যে একেবারে শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করছে!

বিভাস হাসে।—শ্মশানের মতো নয়, একেবারে শ্মশানই বলুন।

বিমূঢ় হয়ে ক-পলক তাকিয়ে থাকে সৌম্য। তারপর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে, অরুন্ধতী কোথায়?

—দার্জিলিং।

—দার্জিলিং!

—হ্যাঁ। বেড়াতে গেছে।

—কিন্তু গেল কার সঙ্গে। একা একা নাকি।

—না। সুনীলবাবুর সঙ্গে।

—সুনীলবাবু! কী বলছেন আপনি!

বিভাস হাসে।—ঠিকই বলছি।

—আপনি যেতে দিলেন! বাধা দিলেন না?

—বাধা দেবার কি আছে!

শ্বাসরুদ্ধ করে, যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আবেগ কোনোমতে চাপা দিয়ে রেখে, বিভাসের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় সৌম্য। কেমন হাসিহাসি মুখ বিভাসের; একটা খেলার পুতুলের মতো নিরঙ্কুশ ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

সৌম্য বলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, বিভাসবাবু।

বিভাস বলে, এই ব্যাপারে বোঝার কিছুই নেই, ভাই। আসুন, ভিতরে বসা যাক।

ক্লান্ত নিশ্বাস ছেড়ে সৌম্য বলে, চলুন।

হাসি মুখে অনর্গল কথা বলে যায় বিভাস। কিন্তু, বুঝতে পারে না সৌম্য, বিভাসের হাসিটা অমন নির্ভয় হল কি করে। সুনীলেব সঙ্গে কোথায় কোন দার্জিলিং-এ অরুন্ধতীকে পাঠিয়ে, আজ অমন নিশ্চিন্ত হয়ে কি কবে হাসছে বিভাস!

জানে না সৌম্য, শুধু আজ বলে নয়, বিভাসেব ঠোঁটেব ওই হাসিটা অনেকদিন আগেই বিস্মিত হতে ভুলে গিয়েছে। এবং, সম্ভবত সেইদিনই প্রথম, যেদিন অরুন্ধতী এই বাড়িতে এল।

বিভাস ভেবেছিল পৃথিবীটাকে ভালবাসবে। কেননা, আমরা ভালবাসতে চাই, তারপর নিজেদেরই ভালবেসে ফেলি, ভালবাসার পরিধি তখন কত সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়! বিভাস তা চায় নি। বরং, সুখে দুঃখে প্রথম হবে, এই তার আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই ইচ্ছা কতকাল মনের মধ্যে আশ্চর্য এক স্বপ্নের মতো নীরবে লালন করেছে বিভাস। বর্তমানকে ছাড়িয়ে আরো দূরে, নিত্য নতুন অনুভবের মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। সুন্দর এই পৃথিবী, কত সুন্দর, ছোট ছোট সুখ, ছোট ছোট দুঃখ, শোক, যন্ত্রণা এবং আশা; সব কিছুর মধ্যে এক জ্যোতির্ময় আলোর সন্ধান করেছিল।

বাড়িটা তখন এইরকম ছিল না। বলতে কি, বিয়ের আগে এইরকম একটা ছোট, সুন্দর, সাজানো গোছানো বাড়ির জন্য কোনো ব্যস্ততাও ছিল না।

বিভাসের মনে। কালীঘাট রোডের একটি ফ্ল্যাটে ছোট একটি ঘর নিয়ে তখন থাকত বিভাস। বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর কিছু বেশি টাকা দিয়েই ফার্ন রোডের এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। শুধু তাই নয়, দূর সম্পর্কের এক পিসী থাকেন কেষ্টনগরে, অভিভাবক হিসাবে তাঁকে ডেকে আনল। বাবা ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছিলেন; আর, চাকরিতে ঢোকবার পরই মা চলে গেলেন। তারপর থেকেই বুকের মাঝে একটা মায়ার স্থান শূন্য করে রেখে দিনের পর দিন, পুরো পাঁচটা বছরই অপেক্ষা করে কাটিয়ে দিয়েছে বিভাস। আশা ছিল বিভাসের, ভরসাও ছিল, শূন্য অভাবটা এইবার কেটে যাবে নতুন খুশির আনন্দে ঝলমল করবে। পৃথিবীটা সুন্দর। এর আলো, বাতাস, অন্ধকার—সবই সুন্দর মনে হয়েছিল বিভাসের।

শ্যামবাজারের বাড়ি থেকে প্রথম যেদিন এ-বাড়িতে এল অরুন্ধতী, তারই পরের দিন সকালে অরুন্ধতীকে একলা পেয়ে বিভাস বলে, নতুন জায়গায় এসে তোমার ভয় করছে না তো?

চোখ তুলে তাকায় অরুন্ধতী। এক পলক, দু-পলক। কোনো সঙ্কোচ নেই, লজ্জার শিহরও নেই। মৃদু, স্পষ্ট কণ্ঠে অরুন্ধতী বলে, কিসের ভয়। কাকে ভয়।

একটু কাঁপে বিভাস। ঠিক এই ধরনের একটা নির্ভয় অসঙ্কোচ প্রশ্ন যেন আশা করে নি। অপ্রস্তুত হেসে বিভাস বলে, না, ভয় করবার কিছু নেই। এ তোমার বাড়ি, তোমারই সব। দুদিন পরে কেষ্টনগর চলে যাবেন পিসীমা, তখন তোমাকেই ঘর-সংসার সামলাতে হবে।

নিরুত্তরভাবে দেয়ালের কোণে একটা স্থূল মাকড়সার গতিবিধি লক্ষ্য করে অরুন্ধতী।

বিভাস বলে, মন কেমন করলে বলো, কাল বাদে পরশুদিনই তোমাকে মা-র কাছে রেখে আসব।

—আমি যাব না।

—সেই ভালো। এখানে আমি রয়েছি, তুমি আমার কাছেই থাকবে। আমি থাকতে তোমার কোনো ভয়. ভাবনা নেই।

দেয়ালের মাকড়সাটা হঠাৎ একটা মাছি দেখতে পেয়ে পা টিপে টিপে

এগুতে থাকে। সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পায় অরুন্ধতী, ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে বিভাস।

অরুন্ধতী ডাকে, শুনুন।

ঘুরে তাকায় বিভাস এবং কাছে এগিয়ে এসে শান্ত গলায় প্রশ্ন করে, কি, বল?

—সুনীলবাবুকে চেনেন?

—হ্যাঁ। কাল যিনি আমাদের পৌঁছে দিতে এসেছিলেন।

—এবার তিনি এলে আমাকে বলবেন। দরকার আছে।

—বলব।

আর কোনো প্রশ্ন না করে এবং আর কিছু শোনবারও অপেক্ষা না করে, আস্তে আস্তে চলে যায় বিভাস।

পরের দিন ফুলশয্যা। শুক্লপক্ষের রাত। বাহারী ফুলের স্নিগ্ধ সুবাসে মিষ্টি হয়ে মাতামাতি করছিল ঘরের বাতাস।

ফুলের শয্যার ওই একেবারে ওপাশে মাথা নিচু করে, আর কেমন একটা ছাড়া-ছাড়া অন্যমনস্ক ভঙ্গী নিয়ে বসে ছিল অরুন্ধতী। জানলার বাইরে আলোকিত আকাশটা দেখা যাচ্ছিল। ধবল জ্যোৎস্নার কণা কণা আলো ছড়িয়ে পড়েছে অরুন্ধতীর চোখে, মুখে আর ঠোঁটে। যেন পবিত্র এক উপহার সেজে নিবেদিতা হবার জন্য স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করছে অরুন্ধতী। মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিভাসের সমস্ত চেতনা অদ্ভুত এক কামনায় পিপাসার্ত হয়ে ওঠে।

নিঃশব্দে এগিয়ে যায় বিভাস; এবং অরুন্ধতীর সেই তন্ময় রূপের শরীরটা ছুঁতে গিয়েই শিউরে ওঠে। যেন ভয় পেয়েই অনেকটা সরে গিয়েছে অরুন্ধতী। বিভাসের চোখের দিকে তাকিয়ে, ভ্রূলতা কঠিন করে, স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অরুন্ধতী। স্বেদ-সিক্ত কপাল, নিশ্বাসটাও পড়ছে অনেকক্ষণ পরে পরে, থেমে থেমে।

—কী হল! বিস্মিত, বিহ্বল, অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করে বিভাস।

সাড়া দেয় না অরুন্ধতী; নড়বার চেষ্টাও করে না।

—এ কী, হঠাৎ অমন করছ কেন! কম্পিত স্বর বিভাসের।

অরুন্ধতী নিরুত্তর।

প্রশ্ন করে বিভাস, তুমি আমাকে ভয় কর?

অরুন্ধতী বলে, না।

হাসতে চেষ্টা করে বিভাস।—তবে, ঘৃণা কর?

—না।

—বিশ্বাস কর না; সন্দেহ কর?

—না।

হালকা নিশ্বাস ছেড়ে বিভাস বলে, তাহলে অমন চমকে উঠলে কেন?

নিথর দাঁড়িয়ে থাকে অরুন্ধতী। কপালের উপর ঘামের বিন্দুগুলি হীরের শোভার মতো জ্বলতে থাকে। বিভাসের দু-চোখের মুগ্ধতাও যেন ভিজে গিয়ে চিকচিক করে। বিভাস ডাকে, এখানে এস।

উত্তর দেয় না অরুন্ধতী। যেন বিভাসের কথাগুলি ও শুনতেই পায় নি।

বিভাস বলে, আজ আমরা এক সঙ্গে থাকব। তাই নিয়ম।

যেন ঈষৎ কেঁপে ওঠে অরুন্ধতী।

বিভাস বলে, রাত হল। ঘুমবার সময় হয়েছে।

—আপনি শুয়ে পড়ুন।

—আর, তুমি!

—না।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বিভাস বলে, কেন?

কোনো সাড়া দেয় না অরুন্ধতী। অরুন্ধতীর ভঙ্গীর মধ্যে ক্ষণেকের জন্যও একটা সাড়ার চেষ্টা দেখা যায় না।

দ্রুত এগিয়ে আসে বিভাস, এবং অরুন্ধতীর কাঁধের উপর একটা হাত রেখে চাপা স্বরে বলে, কি চাও, অরুন্ধতী! কেন অমন করছ! আমি কি জোর করব?

ঝিক্ করে একটা আগুন জ্বলে উঠে সিরসির করে অরুন্ধতীর চোখে। গলার উপর একটা শিরা থেঁত্‌লানো তেঁতুলে বিছের মতো কুঁকড়ে গিয়ে যেন অন্তিম যন্ত্রণায় মোচড় খেতে থাকে।

—তাহলে আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

—না, তা করো না। তাহলে কেলেঙ্কারির আর কিছু বাকি থাকবে না।

হাতটা যেন যন্ত্রণায় খসে পড়ে। সরে যায় বিভাস, এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়; তারপর দু-হাতে কপাল টিপে বিছানার উপর বসে পড়ে। আবার উঠে দাঁড়িয়ে আর দু-হাতে মুখ ঢেকে ব্যস্তভাবেই ঘরের মধ্যে ছুটে বেড়ায় বিভাস। যেন চিন্তার মধ্যে পায়চারি করে প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করছে বিভাস।

আবার থামে এবং ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বালে বিভাস। ইচ্ছা হয়, জ্বলন্ত কাঠিটাকে ওই ফুলের শয্যার উপর ছুঁড়ে দিয়ে এই মিথ্যে আশার শয্যাটিকে জ্বালিয়ে শেষ করে দিতে। সিগারেট ধরিয়ে, এক মুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে বিভাস বলে, ভুলে যেও না, অরুন্ধতী, নারায়ণ শিলা সাক্ষী রেখে, পুরোহিত ডেকে তার মন্ত্র পড়ে আমরা পরস্পরকে গ্রহণ করেছি। আমাদের পরিচয় স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়। বাইরের লোকের চোখে যাতে এ-পরিচয় মিথ্যে না হয়ে যায়, সে চেষ্টা করো। আমার মাথা ধুলোয় লুটিয়ে দিও না।

চুপ করে বিভাস। অরুন্ধতীও কাঁপে না। সারা ঘরের নীরবতা যেন আঘাতে করুণ হয়ে থমথম করে।

নিষ্কম্প স্বরে বিভাস বলে, রাত হয়েছে। এবার তুমি শুয়ে পড়

বলেই আর দেরি করে না বিভাস। দরজা খুলে, এক মুহূর্তও অহেতুক কালক্ষেপ না করে দ্রুতগতি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

জীবনের এই হাসি-কান্নার মধ্যে কোথাও এতটুকু নকল মায়া লুকিয়ে নেই। ভেবে নিশ্চিন্ত হয় বিভাস, বিষের জ্বালাটা বুকের মাঝে পুড়ে পুড়ে একেবারে নিবে গিয়ে সমস্ত সন্দেহের শেষ করে দিয়েছে।

কথামতো ফুলশয্যার পরের দিনই কেষ্টনগরের পিসীমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছে বিভাস। আর, ফেরবার পথে ফার্নিচারের দোকানে গিয়ে নগদ টাকা ফেলে নতুন একটা পালঙ্ক কিনে এনেছে। এখন থেকে আবার পৃথক শয্যা। একটা পালঙ্ক পাতা থাকবে ঘরের এইদিকের কোণে, এবং আর একটা ঘরের একেবারে ওইদিকের কোণ ঘেঁষে।

এই রকম ব্যবস্থাই চলে এসেছে; একদিন কেন, পর পর অনেকগুলি দিন পার হয়ে আজ পর্যন্ত। সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার মধ্যে কোথাও একটু ফাটলের চিহ্ন নেই, যে-ফাটল দিয়ে একবিন্দু সন্দেহ গলে পড়বে। আশ্চর্য! কে বলবে, দুটো জীবনের মাঝে এমন একটা বিশ্রী অস্বস্তি লুকিয়ে রয়েছে! বিভাসকে কোনোদিন কোনো কাজের জন্য অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি; রাগ

করে দুটো কথাও শোনাতে হয় নি অরুন্ধতীকে। আর, অরুন্ধতীও বিভাসের কাজের ধরন-ধারণগুলিকে নিজের হাতের যত্নে আরো মনোরম করে তুলেছে।

প্রিয়নাথবাবুর সঙ্গেই একদিন মেয়ের সংসার দেখতে এসেছিলেন কল্যাণী।

—কেমন আছিস, অরু?

—খুব ভালো, মা।

বিভাস বলে, আজ কিন্তু আপনাদের যাওয়া চলবে না, মা।

কল্যাণী বলেন, তা কি করে হয়! আমার আবার ওদিকে

মা-র গলা জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মতো অরুন্ধতী বলে, না, মা। কোনো কথা শুনব না। বাড়িতে তো পিসীমা আছেনই। সারাদিন এখানে থেকে সেই একেবারে রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারবে।

আর কিছুই বলতে পারেন না কল্যাণী, হাসিমুখে তাকিয়ে থাকেন। এবং মেয়ে জামাইয়ের সুখের জীবনটাকে মনে মনে আশীর্বাদ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যান প্রিয়নাথ।

সময় বুঝে একটু আড়ালে ডেকে অরুন্ধতীর কানের কাছে ফিসফিস করে বিভাস।—আজকের রান্নার ব্যবস্থাটা একটু ভালো করেই করতে হয়, অরু, মা-বাবা এসেছেন যখন।

ভুরু বাঁকিয়ে আর মৃদু হেসে অরুন্ধতী বলে, খুব মানুষ যা হক তুমি! আমার বুঝি সে-জ্ঞান নেই!

—আছে বই কি। তা না হলে

—থাক্ বাবা, থাক্। আর প্রশংসা করতে হবে না।

হেসে ওঠে দুজনেই, এবং হাসতে হাসতেই চলে যায় দুদিকে।

আর একদিন।

সেদিন বিভাসের মাথার ভিতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল বিভাস; এবং ওই কোণের দিকে বিছানার পাশে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে ভীত, কাতর চোখে তাকিয়ে ছিল অরুন্ধতী। ঠোঁটের উপর দাঁত বসে গিয়েছে, যেন মনের ভিতরে একটা বিশ্রী যন্ত্রণার ব্যথাকে কোনোরকমে চেপে রাখতে চাইছে অরুন্ধতী।

বালিশটাকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে বিভাস।

অরুন্ধতী বলে, মাথাটা একটু টিপে দিই?

—না, থাক্।

—কিন্তু···এভাবে আমাকে শাস্তি দিয়ে তোমার কি লাভ! তুমি নিজেও তো কষ্ট পাচ্ছ!

—আর বেশি কষ্ট নেই। তুমি শুয়ে পড়।

পাশ ফিরে শুয়ে থাকে বিভাস। বিভাসের ছটফটানির মধ্যে একটা ঘুমের চেষ্টাও দেখা যায়। কিন্তু অরুন্ধতী ঘুমতে পাবে না।

বোধহয় সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল বিভাস। কিন্তু, হঠাৎ একটা নতুন অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে যায়। দেখতে পায় বিভাস, সরু নরম কতগুলি আঙুল তার মাথার চুলের মধ্যে আকুল হয়ে চলা-ফেরা করে কি যেন খুঁজছে!

আশ্চর্য হয় বিভাস।—এ কী, অরুন্ধতী!

চোখ দুটিকে ঝাপসা করে অরুন্ধতী বলে, কিছু নয়। তুমি ঘুমও।

—কিন্তু, তুমি কি এইভাবেই সারা রাত জেগে থাকবে?

—তুমি ঘুমলেই আমি শোব।

—তবে যাও। আমি দেখতে চাই, সত্যি সত্যিই শুয়েছ তুমি।

—আমি এখানেই, তোমার পাশেই

—কিন্তু

—না। তুমি নিজে তাড়িয়ে না দিলে আমি কিছুতেই ও-বিছানায় যাব না।

—অরুন্ধতী!

চমকে ওঠে বিভাস। এবং তারপরেই সামান্য একটা বিস্ময়ের সুযোগ না নিয়ে অরুন্ধতীর মুখটাকে বুকের উপর চেপে ধরে, এবং দুরন্ত পিপাসায় ঠোঁট দুটি তপ্ত করে তোলে। মনে হয়, ওষ্ঠের সেই তপ্ত খুশিই অরুন্ধতীর দু-চোখের কোল বেয়ে গালের উপর ঝরে ঝরে পড়ছে!

কিন্তু, বিভাসের খুশিটা একেবারে শান্ত হয়ে যাবার আগেই আবার চমকে ওঠে বিভাস, আর কথা বলতেও ভুলে যায়।

মাত্র দুদিন পরেই দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে চাপা, রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করে অরুন্ধতী, সুনীলবাবুকে তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ কেন!

অস্ফুটে বিভাস বলে, তাড়াব কেন! সে নিজেই চলে গেছে।

—কেন ?

—বাজারে বেরবার কথা ছিল। আমি বলেছিলাম, তোমার শরীর অসুস্থ, তুমি যেতে পারবে না।

—কোন অধিকারে বলেছ !

—অধিকার !

—চুপ কর। তুমি কি চাও আমি এ-বাড়ি থেকে চলে যাই !

কি একটা বলতে গিয়েও চুপ করে যায় বিভাস। অরুন্ধতীর গলার উপর সেই নীল মোটা শিরাটা কাঁপছে। চোখের দৃষ্টিটাও বুঝি খুব স্বাভাবিক নয়।

এরপর থেকেই দেখে, শুনে আর বুঝে বিস্মিত হতে ভুলে গিয়েছে বিভাস। অরুন্ধতীর হাসি দেখে বিভাসও হাসে, কান্না দেখে চোখ দুটিকে গম্ভীর করে, খুব প্রয়োজন হলে প্রশ্ন করে, আর, প্রশ্ন করে কোনো জবাব না পেলেও অখুশি হয়ে কিছু একটা মনে করে বসে না। ধরে নিয়েছে বিভাস, তার ভাগ্যটাই ভয়ানক দুর্বল। নিজের ইচ্ছা মতো চলে হেঁটে বেড়াবার মতো শক্তি যে-ভাগ্যের নেই, সে-ভাগ্যের উপর অনর্থক অভিমান করেও কোনো লাভ নেই।

কিন্তু, এইসব ঘটনার কতটুকুই আর জানে সৌম্য।

আজ বিভাসের ওই নির্বিকার ও নিরুদ্বেগ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সৌম্য বলে, আমি ভাবতে পারছি না, এমন একটা কাজ কী করে আপনি করতে পারলেন !

বিভাস হাসে।—পেরেছি তো।

সৌম্য বলে, জোর করলেও পারতেন। আপনার সে-অধিকার আছে।

বিভাস হেসে বলে, অধিকার থাকতে পারে। কিন্তু, সব সময় সেই অধিকারের জোর খাটিয়ে লাভ কি !

কথাটা বলে কেমন উন্মন হয়ে যায় বিভাস। সৌম্যর কথা শুনে বিভাসের মনে একটা করুণ বিদ্রূপ হেসে ওঠে। জোর করে কোনো লাভ নেই, এ আর এমন কি নতুন কথা! এই সত্যি কথাটি যে এতদিনে বুকের পাঁজরে পাঁজরে চিনে ফেলেছে বিভাস।

তবু, জোর না করলেও সামান্য একটা চেষ্টা অন্তত করে ছিল বিভাস।

মাত্র কয়েকদিন আগে বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফিরে অভ্যাস মতো বিভাসের মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিল অরুন্ধতী। দশটা বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ। অনেক রাত হয়েছে। অপেক্ষা করতে করতে চিন্তায় ও অস্বস্তিতে মন ভরে উঠেছিল বিভাসের। বিছানার উপর বসে আনমনা সিগারেট টানছিল বিভাস।

প্রশ্ন করে অরুন্ধতী, অমনভাবে বসে রয়েছ যে?

বিভাস বলে, এমনি।

—খাবে চল।

—খিদে নেই। তুমি খেয়ে নাও।

—তার মানে! বিকেল থেকে না-খেয়ে আছ!

কোনো উত্তর দেয় না বিভাস। এগিয়ে আসে অরুন্ধতী, তারপর কোমল স্বরে বলে, দেরি করে ফিরেছি বলে রাগ করেছ?

—না।

—তবে খাবে না কেন?

—খিদে নেই বলে।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, পাঁচিলের বাইরে সারি সারি বাড়িগুলির ভিড় থেকে আরো দূরে একফালি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে অরুন্ধতী। তারপর বলে, তুমি না খেলে আমারও খাওয়া হবে না।

আর এক মুহূর্তও দেরি না করে উঠে দাঁড়ায় বিভাস; এবং বলে, চল।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফিরে এসে, বিছানার চাদর সমান করে পাততে পাততে অরুন্ধতী বলে, একটা কথা বলব?

—বল।

একটু চুপ করে থাকে অরুন্ধতী। তারপর বলে, আমি একবার দার্জিলিং যাব।

বইয়ের পাতা থেকে চোখ না তুলেই হালকা সুরে জবাব দেয় বিভাস, বেশ তো, যেও।

ঘুরে দাঁড়ায় অরুন্ধতী। —তার মানে!

বইটা বন্ধ করে দেয় বিভাস।—কী হল! যেতে চাইলে, তাই বললাম, যেও। কবে যাবে বল?

—পরশু।

—পরশু! …আর কিছুদিন পরে যেও। আমার ছুটি হলে, আর, সিজন্‌টা একটু ভালো হলে।

—তোমার ছুটির সঙ্গে আমার যাওয়ার কি সম্পর্ক?

—কী বলছ! একা একাই যাবে নাকি?

—না; সুনীল যাবে।

হঠাৎ গম্ভীর হয় বিভাস।—তা হয় না, অরুন্ধতী।

—কেন, হয় না কেন?

—তা ভালো দেখায় না। হয়তো, হয়তো লোকে অনেক কথা বলবে।

—কী বলবে!

বিভাস বলে, কী বলবে, তা তুমিও জান।

—তুমি আমাকে সন্দেহ কর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠ অরুন্ধতীর।

বিভাস বলে, শুধু শুধু সন্দেহ করব কেন!

—তাহলে লোকের কথায় কাজ কী।

চুপ করে, অস্বস্তিতে মনে মনে কাঁপতে থাকে বিভাস।

অরুন্ধতী বলে, তাহলে আমাকে যেতে দিতে তোমার আপত্তি কী? কয়েকদিন পরেই তো ফিরে আসব।

একমুহূর্ত। ক্লান্ত নিশ্বাস ঝরিয়ে বিভাস বলে, বেশ যাও। কিন্তু

—কী?

সাবধানে থেক। শরীরের দিকে লক্ষ্য রেখ। আর, যত তাড়াতাড়ি পার ফিরে এস।

ব্যস্, বিভাসের চেষ্টার কাহিনী মাত্র এইটুকু। সম্মতি দিয়েছে বিভাস, আর, কোনো দ্বিধা, সঙ্কোচ ও সংশয় না রেখেই সুনীলের সঙ্গে দার্জিলিং চলে গিয়েছে অরুন্ধতী। অরুন্ধতী চলে যাবার পরও যথারীতি কাজে বেরিয়েছে বিভাস, খাবার খেয়েছে, আর বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিভাসকে দেখে মনে হয় না, তার জীবনের একটা অশান্তির ঝড়ের পটভূমি অগোচরের সুযোগে ক্রমশ তৈরী হয়ে নিচ্ছে।

চুপ করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ প্রশ্ন করে সৌমা, একটা কথা বলবেন, বিভাসবাবু?

বিভাস হাসে।—বলুন?

সৌম্য বলে, অরুন্ধতী সম্বন্ধে আপনি যেন কেমন উদাসীন। মানে·· ···

—বুঝেছি।

একটু চুপ করে থাকে বিভাস। তারপর বলে, অরুন্ধতী আমার স্ত্রী। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে কেন যে কেউ অমন উদাসীন ভাব পোষণ করে, তা আপনি বুঝবেন না। সুখ দুঃখের কথা বলব না। তবে, অরুন্ধতী যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে বিভাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সৌম্য।

বিভাস বলে, অনেক খুঁজেছি আমি, অনেক ভেবেছি, কিন্তু, কিছুই বুঝতে পারি নি। অরুন্ধতীর ক্ষোভ কোথায়, কোথায় ওর অপূর্ণতা, যদি জানতাম! সুনীলবাবুকে পছন্দ করে না অরুন্ধতী। সুনীলবাবুর দিকে যখন তাকায়, ওর দু-চোখে কী বীভৎস ঘৃণা যে উথলে ওঠে, আপনাকে বোঝাতে পারব না! তবু সেই ঘৃণাটাকে অবলম্বন করেই ও ক্রমশ নিজের যন্ত্রণা বাড়িয়ে চলেছে! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি তা সহ্য করেছি। এখনও করছি। এই জ্বালার জগৎ থেকে পালাতে পারলে আমি বাঁচতাম। কিন্তু, অরুন্ধতী আমাকে যেতে দিচ্ছে না। কোথায় যে এর শেষ হবে!

বিভাস চুপ করে।

তীব্র এক অস্বস্তিতে ছটফট করে সৌম্য। জ্বালা করে চোখ দুটো। চোখভরা এই যে জ্বালা, সেটা শুধু একটা আত্মধিক্কার। অরুন্ধতীর কথা মনে পড়লে রাগ হয় না; সুনীলের উপরেও বিন্দুমাত্র আক্রোশ জাগে না। রাগ হয় শুধু নিজের উপর। নিজেরই বুকের ভিতর ফুটে-ওঠা একটা সুন্দর ভালবাসাকে অসম্মান করে, শুধু অরুন্ধতীরই নয়, বিভাসের জীবনটাকেও যে বিষময় করে তুলেছে সে।

আনমনার মতো কি চিন্তা করতে করতে সৌম্যর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বিভাস এবং বিহ্বল স্বরে বলে, আপনি তো অরুন্ধতীকে জানেন, হয়তো আমার চেয়ে বেশি জানেন। বলতে পারেন, কেন ও এমন হয়ে গেল!

কথা না বলেই অপলকে বিভাসের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে সৌম্য। হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাও করে না। তারপর সহসা উঠে দাঁড়িয়ে, আস্তে আস্তে, খুব মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বলে, আজ নয়, বিভাসবাবু। আর একদিন।

—আর একদিন! পাগলের মতো বিড়বিড় করে বিভাস।

—হ্যাঁ, আর একদিন। হয়তো আমি বলতে পারব। আমাকে একটু সময় দিন।

দরজা খোলাই ছিল। ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় সৌম্য।

বোধহয় এই প্রথম সৌম্যকে বড রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে ভুলে যায় বিভাস।

অরুন্ধতীর মনের অবুঝ খেয়ালটা যেন এতদিনে বিভাসের শান্ত মনের চিন্তায় ধরা পড়ে যায়। আর কিছুই অজানা নেই, প্রায় সবই বলে দিয়েছে সৌম্য। বলতে গিয়ে বাব বার গলা কেঁপেছে সৌম্যব, স্বব রুদ্ধ হয়ে এসেছে। সেইদিনই প্রথম স্নেহার্দ্র মমতায় বিভাস ভেবেছে, সৌম্য তার চেয়ে অনেক ছোট, সৌম্যর মনটাও একটা মেরুদণ্ডহীন সরল মন।

ঘবেব ভিতব সোফায় বসে বইয়েব পাতায় মন ডুবিয়ে আজ আবার সেইসব পুরনো কাহিনীব সাত-পাঁচ ভাবতে থাকে বিভাস। অরুন্ধতীর জন্ত সব চেতনা এতদিন কেমন নিষ্প্রাণ, উদাস হয়ে ছিল। আজ আবাব অরুন্ধতীর সম্বন্ধে নতুন কবে ভাবতে শুরু করেছে। আশ্চর্য হয় বিভাস, কেন এমন হল!

কে জানে কেন, অরুন্ধতীও যেন কেমন বদলে গিয়েছে। দার্জিলিং থেকে ফিবেছে অরুন্ধতী, সেও তো আজ প্রায় তিন মাস হয়ে গেল। বোধহয় তিন মাসেরও বেশি দিন হয়ে গিয়েছে।

দেয়ালেব গা থেকে বিকেলের বৌদ্র-ছায়া সবে যাচ্ছে ধীবে ধীরে। সন্ধ্যা হতে আব বেশি দেবি নেই। কত দ্রুত কেটে যাচ্ছে দিনগুলি! দেখতে পায় বিভাস, অপবিসব বাবান্দায় গালে হাত দিয়ে বসে, চুপ কবে কি যেন ভাবছে অরুন্ধতী। সব সময় কী অত ভাবে অরুন্ধতী! মাঝে মাঝে বুক কেঁপে ওঠে বিভাসের, ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। হঠাৎ কেন এমন হয়ে গেল অরুন্ধতী!

দার্জিলিং থেকে ফিবে আসার পরই অরুন্ধতীর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে বিভাস। সব সময় কি যেন ভাবে, নিজের মনেই ভাবে; আর কাউকে সে-ভাবনার সঙ্গী হতে দেয় না। যেন এই পৃথিবীর সব কথাই ভুলে গিয়েছে অরুন্ধতী; বিভাসের কথাও আর মনে পড়ে না।

ফিরে এসে যেদিন এবং যখন এই বাড়িতে ঢুকল অরুন্ধতী, সেই মুহূর্ত থেকেই যেন পরিবর্তনের পোশাকে নিজেকে ঢেকে এনেছে। বিভাসও দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল সেদিন, কারণ ব্যাপারটা বিস্মিত হবারই মতো।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে একাই নামল অরুন্ধতী। স্যুটকেশটা ড্রাইভারই দরজা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে যায়।

বিভাস বলে, একী, তুমি!

মনে হয়, যেন বিভাসের কথাটা শুনতেই পায় নি অরুন্ধতী।

—একটা চিঠি দিলেই তো পারতে। আমি স্টেশনে যেতাম।

কোনো উত্তর দেয় না অরুন্ধতী।

প্রশ্ন করে বিভাস, সুনীলবাবু কোথায়? তিনিও তো তোমার সঙ্গেই গিয়েছিলেন।

—জানি না।

ঠিক জবাব নয়। কিংবা, অরুন্ধতীব জবাবটাই যেন আর্তনাদ করে ওঠে। ভয়ে ভয়েই বিভাস বলে, তোমার চেহারাটা কিন্তু বড্ড খাবাপ হয়ে গেছে।

—কে বলল! অস্ফুট চিৎকাব কবে অরুন্ধতী।

সূক্ষ্ম হাসে বিভাস।—কাউকে বলতে হবে কেন! আমি নিজেই যে দেখতে পাচ্ছি।

—মিথ্যে কথা! সহসা চমকে ওঠে অরুন্ধতী। এক মুহূর্ত ছটফট করে ঘরের ভিতরে চলে যায়, এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত চেহাবাটাকে আরো ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও উৎকণ্ঠিত করে কি যেন খুঁজতে থাকে।

আশ্চর্য হয়ে বিভাস বলে, অমন কবে কি দেখছ, অরু!

ফিরে আসে অরুন্ধতী।—কি খারাপ হয়েছে, বল? না, আমার চেহারা ঠিকই আছে।

বড় অসহায় আর অসহিষ্ণু স্বব অরুন্ধতীব। অপলকে তাকিয়ে থেকে বিভাস বলে, না, ঠিকই আছে। আমারই ভুল হয়েছিল।

হাঁফ ছেড়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে আর সুস্থ হয়ে বাথরুমের দিকে চলে যায় অরুন্ধতী। কিন্তু বিভাস নড়ে না। তন্ময়ভাবে বুঝতে চেষ্টা করে; কিন্তু চিন্তার সূত্রগুলি প্রত্যেকবারই জট পাকিয়ে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। সকালের

এই প্রসন্ন আলোর দীপ্তি সহসা কেমন অর্থহীন আর অনাবশ্যক বলে মনে হয় বিভাসের।

সকালের আলোটাই শুধু নয়, রাতের আঁধারটাও যেন বিশ্বাসঘাতকতা করে যায়।

অনেকক্ষণ ধরেই স্তব্ধ অনুভূতিতে নীরব ও নির্বাক হয়ে অরুন্ধতীর কাজের ক্লান্ত ব্যস্ততা লক্ষ্য করছিল বিভাস। আঙুলের ভাঁজে সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে ছাই হল, ভ্রূক্ষেপ করে না।

বিভাসের বিছানাটা নিজের হাতেই পরিপাটি করে দেয় অরুন্ধতী; বালিশের ময়লা ঢাকনা বদলে একটা নতুন আর ফরসা খোলস পরিয়ে দেয়। আর তারপর বিভাসকে বিস্মিত করে, অনেকদিনের পুরনো একটা নিয়ম ভেঙে দিয়ে ওপাশের শূন্য পালঙ্কের দিকে এগিয়ে যায়।

কিছু না বলেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বিভাস, একদিন, দুদিন, তিনদিন, এবং তারও পরে আরো একদিন। কিন্তু তার পরের দিন আর চুপ করে সহ্য করতে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না বিভাস।

মনে মনে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল বিভাস। অরুন্ধতী উদ্যত হবার আগেই সে উদ্ধত হয়ে ওঠে।

—অরুন্ধতী।

—কী।

—এ আবার নতুন কি শুরু করেছ। এমন ব্যবস্থা তো ছিল না।

—কিসের ব্যবস্থা।

—ওই আলাদা বিছানা।

জোরে নিশ্বাস ছেড়ে অরুন্ধতী বলে, তুমি শুয়ে পড়। ক্লান্ত হয়েছ।

বিভাসের মুখ-চোখ আর চিবুকের গড়নটাই যেন মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়েছে। এগিয়ে এসে অরুন্ধতীর একটা হাত ধরে বিভাস।—আলাদা ব্যবস্থা তুলে দাও, অরু। হঠাৎ ওই মিথ্যে সাজ আমি সহ্য করতে পারব না।

অনুনয়ের সুরে অরুন্ধতী বলে, হাত ছাড়।

—না। স্পষ্ট কণ্ঠ বিভাসের।

অরুন্ধতীর উজ্জ্বল চোখ হঠাৎ একটু নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে, যেন হঠাৎ একটা ধোঁয়া এসে লেগেছে। কুণ্ঠিতভাবে বলে, জোর করবার শক্তি নেই। ছেড়ে দাও। অত দয়া আমার সহ্য হবে না।

—কে দয়া করেছে! কী বলছ, অরু!

—আমার অনেক দোষ, অনেক অপরাধ। তুমি ক্ষমা করতে পারবে না।

বিভাস হাসে। —কথা না শুনলে বুঝব তুমিই আমাকে ক্ষমা কর নি।

অপ্রস্তুত হয়ে আর ভীতভাবেই বিভাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অরুন্ধতী। বিশ্বাস হয় না, চোখ দুটো জ্বালা করে, যেন অন্ধ হয়ে যাবে। আজ এক বছরের মধ্যে বিভাসকে দেখে কোনোদিন, এরকম মনে হয় নি, দেখতে এরকমও লাগে নি। যেন জগৎ-ছাড়া এক ক্ষমা আর সংকল্পের পুরুষ! থরথর করে কেঁপে ওঠে অরুন্ধতী, দুটো বড় বড় স্বচ্ছ জলের ফোঁটা টলমল করে দু-চোখের কোণে। আস্তে আস্তে নত হয়ে আসে অরুন্ধতীর মাথা। কিসের ভারে অথবা কিসের ঝোঁকে যেন বুঝতে পারে না। বিভাসের বুকের উপর কপাল নামিয়ে দিয়ে অলস ও অবসন্নের মতো পড়ে থাকে অরুন্ধতী।

বিভাস বলে, শোবে এস।

বেশ স্বচ্ছন্দ একটা আনন্দের অনুভূতি নিয়ে রাত কেটে যায়। ভোর হয়। ঘুমবার আগে যার কথা মনে হয়েছিল বিভাসের, ঘুম ভাঙার পরও আবার তাকেই মনে পড়ে। আর কাউকে নয়, আর কারও কথা নয়। দেখতে পায় বিভাস, নরম মাংসে গড়া একটা অবোধ অসহায় শিশুর মতো তারই বুকের কাছে কুঁকড়ে ছোট হয়ে আর ঠোঁট দুটিকে একটু ফাঁক করে একেবারে অচেতন হয়ে শুয়ে রয়েছে অরুন্ধতী। অগোছাল কয়েকটা চুল কপালে, ঠোঁটের ফাঁকে শাদা ম্লান ছোট্ট একটা দাঁত দেখা যাচ্ছে। থেমে থেমে নিশ্বাস পড়ছে অরুন্ধতীর। দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় বিভাস, চোখ ফেরাতে পারে না।

পরের দিনগুলিও এমনি করেই এক একটা আনন্দের পরমায়ু নিয়ে কেটে যায়। আর বিভাসের মনের সেই প্রথম দিনের সন্দেহটা আবার ভিতরে ভিতরে ছটফট করে। যত দিন যাচ্ছে, অরুন্ধতীর চেহারাটাও কেমন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! চোখের কোলে ওই সন্ত্রস্ত ছায়াটাই বা কিসের ভয়ে সর্বদা অমন কাঁপে! আর, সব সময় কী-ই বা অত ভাবে অরুন্ধতী!

উঠে দাঁড়ায় বিভাস, এবং অরুন্ধতীর একেবারে কাছে গিয়ে পিঠের উপর একটা হাত রাখে।

ঘুমন্ত হৃৎপিণ্ডে যেন হঠাৎ একটা সাপের ছোবল পড়েছে, শিউরে উঠে ঘুরে তাকায় অরুন্ধতী। কি রকম যেন হয়ে যায় অরুন্ধতীর চেহারাটা।

বিভাস বলে, একটা কথা বলব ?

—কেন !

—চল, একবার ডাক্তারের কাছে ঘুরে আসি।

—না, না। আতঙ্কিত হয় অরুন্ধতী।

বিভাস হেসে বলে, অমন চমকে উঠলে কেন! তোমার শরীরটা সত্যিই দিন দিন ভেঙে পড়ছে। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে নিশ্চয়। কি হয়েছে, সেটা জানবার জন্যেই তো ডাক্তারের কাছে যাওয়া।

—বিশ্বাস কর। আমার কিচ্ছু হয় নি।

—তাহলে আমার সন্দেহটাকে মিথ্যে করে দেবার জন্যেই অন্তত চল।

চমকে ওঠে অরুন্ধতী। মাথা হেঁট করে। দুর্বল হাতটা দেয়ালের উপর আস্তে আস্তে কেঁপে কেঁপে ঘষা খায়। দেয়ালটাকেও শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারে না অরুন্ধতী। বুকের ভিতর সব নিশ্বাস যেন মরতে বসেছে। শিরদাঁড়াটা থরথর করে কেঁপে ওঠে।

আবার বলে বিভাস, সব সময় অমন চুপ করে কী ভাব, বল তো ?

সাড়া দেয় অরুন্ধতী। মুহূর্তের মধ্যে, যেন একটা নিশ্বাসের জোরে নিজেকে শক্ত করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কী বলছ ?

—এত অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলে এতক্ষণ ?

—ও কিছু নয়।

একটু চুপ করে থেকে বিভাস বলে, এখন অত ভাবলে চলে না। সব সময় হাসিখুশি থাকতে হয়।

—কী বললে !

একটা অন্ধ স্নেহের উদ্বেগ যেন ঢিপঢিপ করছে বিভাসের বুকে। মুখের হাসিটাকে কোনোরকমে লুকিয়ে রেখে, বিভাস বলে, পরে বলব।

আর দাঁড়ায় না বিভাস। আস্তে আস্তে হেঁটে বারান্দা পার হয়, এবং তারপর ঘরের মধ্যে সোফায় বসে আবার বইয়ের পাতা ওলটাতে থাকে। যেন সমস্ত ভাবনার ভার নেমে গিয়েছে বিভাসের।

মেয়েমানুষের জীবন; বিয়ে করবে না আর ভবিষ্যতে একটা সুন্দর, রঙীন সংসার সাজিয়ে তোলবার ছিটে-ফোঁটা স্বপ্নও দেখবে না, তা কী করে হয়! এই বয়সেই যদি মনের অনুভূতিগুলি সব সূক্ষ্মতা হারিয়ে অসার হয়ে যায়, তাহলে আরো কিছুদিন পরে, যখন বয়স বাড়বে, মনের রঙ ফিকে হয়ে যাবে, তখনই বা করবে কী?

অতনু একদিন এই কথা ভেবেছিল। বলেও ছিল জয়ন্তীকে। কিন্তু কিছুতেই জয়ন্তীকে বুঝিয়ে শান্ত করতে না পেরে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে।

ল্যান্সডাউন রোডের সেই বাড়ির ঘরে বসে রায়বাহাদুরও আজ এই কথাই ভাবেন। জয়ন্তীর এই একগুঁয়েমি মেজাজের স্বভাবটাকে বুঝতে ও বাধ্য করতে না পেরে এবার যেন সত্যি সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছেন রায় বাহাদুর।

জানলার পাশে একটা মোড়ার উপর স্থির হয়ে বসে ছিল জয়ন্তী; যেন নিঃশব্দে বাগানের ঝাউয়ের কাছে একটু বাতাস প্রার্থনা করছে। কিন্তু ঝাউ বড় শান্ত!

রায়বাহাদুর বলেন, যাদবপুরের ক্যাপ্টেন দাশগুপ্তর মেজ ছেলে সিদ্ধার্থ এঞ্জিনিয়ারিং-এ তিনটে ভালো ডিগ্রী নিয়ে ইংলণ্ড থেকে ফিরেছে মাত্র ছ-মাস হল। সামনের বছরেই আবার গ্লাসগো যাবে। বয়স উনত্রিশ ত্রিশ। আর, যেমন কেরিয়ার, চেহারাটাও তেমনি একেবারে রাজপুত্রের মতো।

হেসে ফেলে জয়ন্তী। —বাঃ, তাহলে তো খুব ভালো ছেলে।

—হ্যাঁ। ছেলে খুবই ভালো। এক মুহূর্ত ইতস্তত করেন রায়বাহাদুর। —তাহলে এই ছেলেটির সঙ্গেই

—কী!

—এই ছেলেটির সঙ্গেই তোর সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলি?

চোখ তুলে তাকায় জয়ন্তী।—তুমি দেখছি আমাকে পর করে দেবার জন্যে বড্ড ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, বাপি।

অপ্রস্তুতভাবে রায়বাহাদুর বলেন, পর না করে দিলে তোকে দেখবে কে? আমি আর কদিন! আমি মরলে কে দেখবে তোকে? আর এই বাড়ি ঘর-দোর এসবই বা দেখবে কে?

কোনো মন্তব্য করে না, উত্তর দেয় না জয়ন্তী।

রায়বাহাদুর বলেন, এই রকম একা একা আমি আর থাকতে পারব না। আমারও একটা ইচ্ছে-টিচ্ছে থাকতে পারে তো।

বসে বসেই হঠাৎ পা দুটো টলে ওঠে জয়ন্তীর। ধকধক করে বুকের ভিতরটা। নিশ্বাস বিচলিত হয়। জয়ন্তীর মনের চিন্তাগুলিই বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিতে ভুলে যায়।

রায়বাহাদুর বলেন, আমি আর কিছু বলব না। যাকে খুশি, যেমনই দেখতে শুনতে হক, তুই নিজেই পছন্দ করে বিয়ে কর। ওই যে-ছেলেটি আসে

—বাপি! আর্তনাদের মতোই শোনায় জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর। উঠে দাঁড়ায় জয়ন্তী। তারপরেই পায়চারি করে জানলার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে থাকে।

বিমূঢ় হয়ে, বিস্মিত হয়ে এবং বিব্রত হয়ে, যেন একটা কাতর ইচ্ছাকে কোনোরকমে শান্ত করে রায়বাহাদুর বলেন, তোর ভালোর জন্যেই বলছিলাম, মা। তুই যদি বুঝিস্ এতে তোর ভালো হবে না, তাহলে থাক।

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যান রায়বাহাদুর।

নিতান্তই আকস্মিক, অভাবিত এবং বিসদৃশ একটা দৃশ্য। যা কখনো, কোনোদিন হয় নি, আজ তাই হল। দূরের বারান্দায় রায়বাহাদুরের গলার অস্পষ্ট কাশির শব্দ এখনো শোনা যায়।

হঠাৎ চমকে ওঠে জয়ন্তী। তার প্রতিজ্ঞার বিশ্বাসটাই যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে। এ কী অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা, যার গুমটে জীবনের সবচেয়ে নির্ভয় স্নেহের আশ্রয়টাকেই আঘাত হেনে কাঁদিয়ে দিতে হয়। এতক্ষণের শুদ্ধতার ধাতুতে গড়া পাথুরে চক্ষু দুটি গলে গিয়ে এইবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

বাগানের ঝাউ শান্ত। চারদিকের শব্দ প্রায় লুকিয়ে পড়েছে। চোখ মুছতে মুছতে দরজা পার হয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল জয়ন্তী। সেই সাধারণ, আটপৌরে পোশাক; একটা নতুন শাড়িও বদলে গায়ে জড়িয়ে

নিতে ভুলে গেল জয়ন্তী। চটিটা পায়ে গলিয়ে, যেন একটা জ্বর-বিকারের জালায় সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে, ফটক পার হয়ে দুপুরের তপ্ত পথের ধুলোয় মধ্যে এসে দাঁড়াল।

এক মুহূর্ত থমকে পথের উপর দাঁড়িয়ে থেকে, সোজা এগিয়ে যায় জয়ন্তী। পা দুটো কি রকম ভারী হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো এখনো ভিজে ভিজে লাগে। কিসের যেন একটা ইচ্ছা থেকে থেকে তীব্র যন্ত্রণায় মোচড় দিচ্ছে সর্বাঙ্গে। এ-বাড়িতেও আব দুদণ্ড সুস্থ হয়ে, স্বস্তিতে ও শান্তিতে থাকতে পাবা যাচ্ছে না। চোখের সামনে দিনে দিনে রায়বাহাদুবের ওই কোমল ও জীর্ণ শবীর ও মনে যে-ফাটল ধবে যাচ্ছে, তাও যে দুঃসহ। কিন্তু কাউকে কিছু না বলে, এ-বাড়িব জীবনের কাছে কোনো কথাব কৈফিয়ত না রেখে, নিঃশব্দে সরে গেলেই কী ওই ফাটল জোড়া লাগবে।

শ্যামবাজারগামী একটা বাস আসছিল। থেমে দাঁড়াল জয়ন্তী।

কে জানে, জয়ন্তীব চোখেব মধ্যে কোন পিপাসা লুকিয়ে রয়েছে। রায়বাহাদুর বোঝেন নি, অতনুও বোঝবার চেষ্টা করে নি। জয়ন্তী নিজেই কী জানে? সন্দেহ হয় জয়ন্তীব, তার মনে সত্যিই আজ কোনো পিপাসা বয়েছে কিনা।

অথচ, সত্যিই এই মনে একদিন অনেক বড স্বপ্ন পুষেছে জয়ন্তী। আরো একজনকে ঘিরে রূপেব আর কামনাব জীবনকে সুন্দর ও অনন্ত করে বাধবার এক অপার্থিব শিল্প যেন মনে মনেই আয়ত্ব কবে নিয়েছিল জয়ন্তী। আস্তে আস্তে জীবন কেটে যাবে, কিন্তু জীবনের রঙ কখনো ফিকে হবে না, ফুরবে না, ঝরে পডবে না, হাসিতে নিশ্বাসে ও দৃষ্টিতে চির বসন্তের আমোদ এসে বাসা বাঁধবে, এই তো ছিল তাব স্বপ্নের ইচ্ছা। কিন্তু ধুলো কাঁটা আব সমস্যায় ভরা এই পৃথিবীতে সেই বসন্ত বুঝি আর এল না। জয়ন্তীর জীবনেব স্বপ্নেরও পৃথিবীর কারো কাছে আজ আর কোনো দাবী নেই।

ভাবতে ভাবতেই শ্যামবাজার এসে যায়। নেমেও পড়ে জয়ন্তী।

এই বরং ভালো। দাবী পূরণ না হোক, দাবীর দম্ভটা অন্তত বুকের মাঝে শাদা হয়ে ফুলের মতো ফুটে থাকবে। সেই ফুলের সৌরভের গর্বই তো তার মনটাকে সর্বদা মাতিয়ে রেখেছে; নিশ্বাসের অনুভবের মাঝে একটা সাহসের জোর এনে দিয়েছে যেন। সৌম্যকে ভালবেসেও আজ

আর কোনো আশা করে না জয়ন্তী। কিন্তু, এই ব্যর্থ আশার কাহিনী কোনো দিনই তো পাঁজর ভেঙে সৌম্যর পায়ে লুটিয়ে পড়ে নি। বরং স্বমহিম হয়ে নিজেরই ঐশ্বর্যে ধন্য হয়ে আছে। নইলে, নইলে রায়বাহাদুরের অনুনয়টাকেই বা অমন স্পষ্টভাবে কী করে নাকচ করে দিল জয়ন্তী।

অনেকদিন পরে হঠাৎ জয়ন্তীকে দেখে আশ্চর্য হন বিভাময়ী।

—এস, মা, এস। ভালো আছ তো?

—হ্যাঁ, মাসীমা। ভালো আছি। বিভাময়ীর পাশেই গা-ঘেঁষে কোনো সঙ্কোচ না রেখে বসে পড়ে জয়ন্তী।

বিভাময়ী বলেন, তোমার চেহারা আর বেশ-বাশ দেখে মনে হচ্ছে হঠাৎ রাগ করে কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে চলে এসেছ।

জয়ন্তীর কালো চোখের তারা তেমনই স্নিগ্ধ থাকে, একটুও চমকে ওঠে না।—কার ওপর রাগ করব, মাসীমা, যে ঝগড়া করে চলে আসব।

ক্ষণিক চুপ করে থেকে বিভাময়ী বলেন, যাও, মা। সৌম্য ঘরেই আছে।

—হ্যাঁ, যাই।

উঠে দাঁড়ায় জয়ন্তী। সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে ক্লান্ত পা দুটিকে কোনোরকমে টেনে উপরে উঠতে থাকে।

জয়ন্তীকে দেখেই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় সৌম্য।—আরে, তুমি! তোমার কথাই ভাবছিলুম এতক্ষণ।

জয়ন্তী বলে, আমার কথাও তাহলে তুমি ভাব।

—বা-রে ভাবব না। যাক্, সুখবর রয়েছে।

—বেশ, লক্ষ্মী ছেলের মতো আমার সঙ্গে একটু বাইরে চল। সেই-খানেই শুনব তোমার সুখবর।

—কিন্তু, হঠাৎ যাবেই বা কোথায়?

—কেন, যেদিকে দু-চোখ যায়। যেতে ভয় করবে বুঝি?

—তা একটু করবে। তুমি যখন রয়েছ, ভয় ভাঙাবার দায়িত্বও তোমার। চল।

পাশাপাশি হেঁটে সিঁড়ি ধরে নেমে যায় দুজনে।

সন্ধ্যার কিছু আগেই বাড়ি ফিরল সৌম্য। অনেকক্ষণ জয়ন্তীর সঙ্গে

কাটিয়ে, নানারকম কথা বলে, গল্প করে আর আজেবাজে তর্ক করে একটু ক্লান্ত হয়েছিল ; দেহে আর মনে কেমন জোর পাচ্ছিল না। পথ হাঁটছিল অন্যমনস্কভাবে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ থেমে পড়তে হল। ভ্রূকুঞ্চিত হয় সৌম্যর। দেখতে পায়, তাদেরই বাড়ি থেকে বেরিয়ে জীর্ণ পরিশ্রান্ত একটা চেহারা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ওই তো অরুন্ধতী! চোখ-মুখ কেমন ভাঙা ভাঙা, হাত পা আলগা আলগা ; কী বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েছে অরুন্ধতীব!

এইরকম আকস্মিকভাবে অনেক দিন দেখা হয় নি অরুন্ধতীর সঙ্গে।

সৌম্য বলে, তুমি!

জোর করে হাসবার চেষ্টা করে অরুন্ধতী।—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

—এসেছিলে কোথায়?

—মাসীমার কাছে।

—যাচ্ছ কোথায়?

অরুন্ধতী হাসে।—যেখান থেকে এসেছি।

—ও। সহসা চুপ করে যায় সৌম্য। অরুন্ধতীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চেষ্টা করে। এবং বোধহয় ঠিক ভালো করে বলবার মতো কথা মুখের কাছে খুঁজে পায় না।

—এত দূরে এসে আবার ফিরে যাবে? কোনোরকমে বলে সৌম্য।

একটু কাঁপে অরুন্ধতী। অরুন্ধতীর চোখে যেন জ্বালাভরা ধোঁয়ার ছোঁয়া এসে লেগেছে। কোনো কথা বলতে পারে না অরুন্ধতী।

অরুন্ধতীর একটা শীর্ণ হাত এইবার ধরে ফেলে সৌম্য। বিহ্বল স্বরে বলে, এস।

চৌকাঠ পেরিয়ে সিঁড়িগুলোও একের পর এক নিঃশব্দে পার হয় দুজনে। ঘরে ঢুকে হাত ধরেই অরুন্ধতীকে বিছানার উপর বসিয়ে দেয় সৌম্য। তারপর হঠাৎ বলে, বিভাসবাবুর সঙ্গে আজই দেখা হয়েছিল।

—কী বলল? ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে অরুন্ধতী।

সামলে নিয়ে সৌম্য বলে, কী আর বলবেন! আমিই সব বললাম।

অরুন্ধতী হাসে। কিন্তু তার হাসিটাকে দেখতেই ভুলে যায় সৌম্য। অন্যমনস্ক হয়ে বিভাসের মুখটাকেই বার বার মনে করতে চেষ্টা করে।

সত্যি নয়, অরুন্ধতীর কাছে এই মাত্র কতগুলি মিথ্যা কথাই বলতে হল।

বিভাসের সঙ্গে সত্যিই দেখা হয়েছিল আজ। দেখা হতেই এক সঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলেছে বিভাস। চেহারাটা একটু শীর্ণ হলেও মোটামুটি আগের চেয়ে ভালোই আছে অরুন্ধতী। মনও বেশ পরিষ্কার। আর সুনীল নামে সেই নোংরা ছায়াটাও আর এ-বাড়িতে উঁকি-ঝুঁকি দেয় না; দার্জিলিং যাবার পর থেকেই কোথায় অদৃশ্য হয়েছে! আরো বলেছিল বিভাস, অরুন্ধতীর এই একা একা নিঃসঙ্গ ভাবনার স্বভাব আর বেশি দিন থাকবে না। বাড়িটাও সব সময় আর থমথমে ও নির্জন মনে হবে না। মাত্র তিনটে মাস। ফার্ন রোডের বাড়ির প্রাণ যে আর কয়েক মাস পরের মধুর এক আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে!

কথা বলতে বলতে বিভাসের চিন্তাগুলি বোধহয় একটু উন্মন হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে দেবি হয় নি, অনাগত এক তৃষ্ণার্তকে বুকে তুলে নেবার আশায় বিভাসের সারাক্ষণের ভাবনাগুলি এরই মধ্যে পীযূষময় হয়ে উঠেছে। শুনে খুশিই হয়েছিল সৌম্য।

কথাগুলি অরুন্ধতীকে বলবার জন্য ডেকে আনল, কিন্তু এখন অরুন্ধতীর চোখ দুটো দেখে কেমন সন্দেহ হয়। চুপ করে অরুন্ধতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সৌম্য, যেন এই সংসারের বাইরের একটা অদ্ভুত বস্তুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে তার এলোমেলো মন, অথচ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অরুন্ধতী বলে, আমি যাই, সৌম্যদা।

—কেন!

—ভালো লাগছে না।

—হঠাৎ এমন হয়ে গেলে কেন? আকস্মিক প্রশ্ন করে সৌম্য।

কোনো জবাব দেয় না অরুন্ধতী। জলে ধোওয়া কাঁচের মতো চকচক করে চোখ দুটো।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরে ঢুকে ঘরটাকে কেমন অস্পষ্ট করে দিল। সেই ধূসর অন্ধকার সরিয়ে অরুন্ধতীর মুখটাকে বার বার চেষ্টা করেও আর দেখতে পাচ্ছিল না সৌম্য।

কয়েক মুহূর্ত পরে আস্তে আস্তে বলে, চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

কার্ন রোডের বাড়ি থেকে হাসিখুশি ব্যস্ততা নিয়ে এই মাত্র যে-লোকটি বেরিয়ে গেল, সে বিভাস।

কপাটের গায়ে একটা হাত রেখে, বিভাস অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও শূন্য চোখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে অরুন্ধতী। তারপর, যেন একটা ভুলের জ্বালা চাপা দেবার জন্যেই চোখের উপর আঁচল চাপা দিয়ে চলে আসে। কোথায় গেল বিভাস, তা আর অজানা নেই। হাসপাতালে একটা সাহায্যের ব্যবস্থা পাকা করতে গেল বিভাস। আজ না হক কাল, কাল না হক আরো কয়েকটি দিনের মধ্যেই একটা মনোরম ইচ্ছাকে নিখুঁত সম্মান জানানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে বিভাস।

আনমনার মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল জানে না অরুন্ধতী। হঠাৎ চোখে পড়ে, পুবের আকাশটা মেঘলা হয়ে উঠেছে। সূর্য প্রায় ডুবে এল। পশ্চিমের আকাশ কি রকম লাল আর পুবের আকাশটা একেবারে কালো।

অনেকক্ষণ ধরেই মনের ভিতর একটা অস্বস্তিকর যন্ত্রণা অনুভব করছিল অরুন্ধতী। এখন, ওই আকাশটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শিউরে উঠল। এইমাত্র বিভাস তার দিকে তাকিয়ে, প্রসন্ন হেসে যে-কথাগুলি বলে গেল, তা যে কোনোরকমেই সহ্য করতে পারছে না অরুন্ধতী।

হেসে হেসেই বলছিল বিভাস, আজকাল তোমায় ভারি সুন্দর দেখায়, অরু। এত সুন্দর বোধহয় তুমি কোনোদিন ছিলে না।

আতঙ্কিতভাবে কি একটা জবাব দিতে গিয়েও চুপ করে গিয়েছে অরুন্ধতী। বিভাসের হাসি সহ্য হয় নি।

বিভাস বলে, তোমার ভিতরের আর একজনের রূপেই তুমি সুন্দর হয়ে উঠেছ।

অসহ্য এই স্তুতি। চমকে উঠেই মাথা হেঁট করে অরুন্ধতী। বিভাস জানে না, তার এই নিশ্বাসের বিশ্বাসটা কী ভয়ানক মিথ্যা। চোখের দৃষ্টিই বোধহয় বদলে গিয়েছে বিভাসের; নইলে অরুন্ধতীর এই মরা চেহারাটাকেই বা প্রশস্তি জানায় কী করে।

বোঝা যায় না, বারান্দার মেজের দিকে, না তার নিজেরই কোলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অরুন্ধতী। দশ মাসের একটা যাতনা শেষ হতে চলল, কিন্তু অরুন্ধতীর প্রাণটা খুশি হতে পারল কই! বরং দুঃসহ এক উদ্বেগে দিনে দিনে হাত-পা সিঁটিয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট হাত পায়ের দুরন্ত খেলায় ভরা একটা পৃথিবীর কল্পনা করতে গিয়ে চোখের সব বিস্ময় আর বুকের সব নিশ্বাস আর্তনাদ করে উঠছে। এই রঙীন কল্পনায় সাজানো পৃথিবী থেকে পালিয়ে যাবার জন্যেই যেন ছটফট করে চারিদিকে তাকিয়ে পালাবার পথ খোঁজে অরুন্ধতী।

বিভাস বলে, হাসপাতালের ডাক্তার আজকেই বিকেলে একবার দেখা করতে বলেছিল। আমি ঘুরে আসি।

অসহায়ের মতো চোখ তুলে তাকায় অরুন্ধতী।

যেতে যেতেও ফিরে আসে বিভাস এবং সান্ত্বনার স্বরে বলে, ভয় কী, আমি তো আছিই। তোমার কোনো ভাবনা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ফিরে আসব। কেমন?

চলে যায় বিভাস।

বুকের ভিতর সব নিশ্বাস যেন মরতে বসেছে। শিরদাঁড়াটাকে থরথর করে কাঁপিয়ে ঘরের মধ্যে ছুটে এসেই সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয় অরুন্ধতী।

বিভাস জানে না, আর হয়তো অরুন্ধতীও ভালোভাবে জানে না, এই ছোট্ট সুন্দর বাড়ির রঙীন উৎসবটাকে কেন অভিবাদন জানাতে পারছে না অরুন্ধতী। দুস্তর এক ভয়ের ছায়া যেন সব সময় চোখের তারা দুটোয় একটা কামড় বসিয়ে দেবার জন্যে ছুটে আসছে!

ভয়, ভয়, ভয়! চতুর্দিকে, আড়ালে যেন এক ষড়যন্ত্র ফিসফিস করছে। একবার রক্ত জল হয়, নিশ্বাস ঠাণ্ডা হয়ে আসে, পরমুহূর্তেই আবার ঘামতে শুরু করে অরুন্ধতী। চোখের সম্মুখে অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে।

বিছানার উপরেই লুটিয়ে পড়ে অরুন্ধতী। বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে ছটফট করে। দেহের ভিতরে ছোট অঙ্কুরটা আর ছোট হয়ে থাকতে চাইছে না; পৃথিবীর আলো বাতাসের স্পর্শ নেবার লোভে দুরন্ত আগ্রহে অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজছে! সেই অঙ্কুরটাকে দু-হাতে তুলে নিয়ে বুকের কাছে একটা নির্ঝরের সন্ধান পাইয়ে দেবার জন্য মনের একটা স্নেহান্ধ শখ মধুময় হয়ে উঠতে গিয়েও, বার বার ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। কে জানে,

এই অঙ্কুব কী বকম হবে। অনেকদিন আগেই যে এই অভিশাপটাকে চিনে ফেলেছে অরুন্ধতী। তবু, মনে-প্রাণে ঘৃণা কবতে গিয়ে কেমন একটা মমতাও এসে পড়ে। কী বকম আবার, বিভাসেব সন্তান বিভাসের মতোই হবে। কিন্তু · । এরই মাঝে একটা কিন্তু-র প্রশ্ন এসে ভাবনাগুলোকে বার বার কলুষিত কবে দিচ্ছে। বিভাসের মতো না হয়ে যদি সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে যায়! তাহলে—তাহলে—

দু-চোখে বিষের ধোঁয়া জ্বলতে থাকে অরুন্ধতীর। মাথাটা কেমন কেমন করে ওঠে, হাত-পাগুলি তেতে ওঠে আর কাঁপতে থাকে, নিশ্বাসের বাতাসটা জ্বলতে থাকে। পাগলের মতো দুটো চোখ নিয়ে বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকায় অরুন্ধতী। যেন এই মুহূর্তে আত্মহত্যা করার জন্য তৈরী হয়েছে একটা আতঙ্কিত বিকারের রোগী।

দু-হাতে মাথার চুলগুলিকে টেনে ধরে ছিঁড়ে ফেলতে চায় অরুন্ধতী। হাঁসফাঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে আয়নাব সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। মনে মনে লুকিয়ে রাখা সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের ছবিটা যেন আবো নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে আয়নার বুকে। অলীক ভাবনা নয়, কল্পনাও নয়; সত্যিই সেই দুঃস্বপ্নের আত্মা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে!

দু-পা পিছিয়ে যায় অরুন্ধতী। নিশ্বাসের স্তরে স্তরে নিবিড় এক অনুভবের যন্ত্রণা ধক করে জ্বলে ওঠে। মাত্র একটি ভুল; দার্জিলিংয়ের কোন হোটেলের একটা অসহায় মুহূর্তের সাংঘাতিক ভুল যেন চমকে ঘুম ভেঙে আর মোহ ছিঁড়ে জেগে উঠেছে!

আর নয়, আর সহ্য করা নয়। ওই একটি মাত্র ভুলের স্মৃতি ভাঙা সহস্র-মুখ কাচের মতো সমস্ত জীবন বুকে বিঁধবে। না, এ-যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না।

টেবিলের উপর থেকে পাথরের ভারী ফুলদানিটা মুঠো করে তুলে নিয়ে, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে, একেবারে বীভৎস ও হিংস্র হয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে অরুন্ধতী। আয়নার বুকে নিথর হয়ে যে-ছায়া কাঁপে, দেখে মনে হয় না তা অরুন্ধতীরই চেহারা। নির্মম এক প্রতিশোধের বাসনা যেন রক্তাক্ত হবার স্বপ্ন দেখছে!

মাত্র একমুহূর্ত। তারপরেই কাপড়ের বাঁধন খসিয়ে ফেলে মুক্ত নিম্নাঙ্গের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে অরুন্ধতী। সুস্পষ্ট অভিবাদনের ভঙ্গীতে নত

হয়ে আছে সুডোল সুকোমল স্ফীতোদর। আসন্ন মাতৃত্বের রসে উর্বর একটা উল্লাসের তরঙ্গ যেন ছুটোছুটি করছে। দুঃসহ যন্ত্রণার আবেগে থরথর করে কাঁপে অরুন্ধতী, ঘাড়ের রগ দপ করে ফুলে ওঠে, বড় বড় ঘামের ফোঁটা মটরমালার মতো চিকচিক করে কপালে।

শক্ত হাতে পাথরের ফুলদানিটা চেপে ধরে অরুন্ধতী। লাল ঠোঁট দুটি যেন বিষিয়ে নীল হয়ে গিয়েছে। দু-চোখ বন্ধ করে, মাত্র একটি আঘাত হেনে সমস্ত যন্ত্রণার শেষ করে দেবার আগেই, ঝনঝন শব্দে দরজার কপাটে একটা নতুন ধরনের আঘাত বেজে ওঠে।

হাতের ফুলদানি খসে পড়ল মেজের উপর, বাইরের শব্দে ভিতরের এই শব্দ নিঃশব্দে হারিয়ে গেল। টেবিলে ফুলদানিটা রেখে দিয়ে, কাপড় গুছিয়ে, দরজায় মাথা রেখে শক্ত-হয়ে-যাওয়া বুকের ঢিপঢিপ শব্দ শোনে অরুন্ধতী। এবং তারপর বিভাসের অসহিষ্ণু ডাকের শব্দটাকে শান্ত করবার জন্য ব্যস্ত হয়।

বেশ হতভম্ব হয়েছিল বিভাস। ঘরে ঢুকে সভয়ে তাকিয়ে থাকে অরুন্ধতীর দিকে।

—এ কি! কী হয়েছে তোমার!

বিড়বিড় করে কী যে বলে অরুন্ধতী, বোঝা যায় না।

বিস্মিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এগিয়ে এসে অরুন্ধতীর একটা হাত ধরে বিভাস।—এ কি, এত ঘেমেছ কেন?

উত্তর দেয় না অরুন্ধতী। মাথা হেঁট করে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে অরুন্ধতীর কপালে ঘামের বিন্দুগুলি মুছে দিতে দিতে হাসি মুখে বিভাস বলে, দরজা বন্ধ দেখে আর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সত্যিই বড় ভয় পেয়েছিলাম। কী হয়েছিল বল তো?

আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি ছিল না। শান্ত, নিরুত্তাপ গলায় অরুন্ধতী বলে, কিছু নয়।

বিভাস হাসে।—হঠাৎ খুব ভয় পেয়েছিলে বুঝি?

মুখ নিচু করে অরুন্ধতী।

—ছি, ভয় করবার কী আছে! এ সময় ভয় পেতে নেই।

অরুন্ধতীর হাতটা বড় শক্ত করে ধরেছিল বিভাস, যেন অনেক সন্ধানের পর এক পলাতক মায়াকে এতক্ষণে কাছে পেয়েছে। দু-হাত দিয়ে ধরে রেখেছে তার একটি হাত, যেন আবার হারিয়ে না যায়।

বিভাস বলে, সব ব্যবস্থাই করে এলাম। আর কোনো অসুবিধে হবে না।

অরুন্ধতীর ফ্যাকাশে মুখের উপর নিবিড় এক লজ্জার ছায়া রক্তাভ হয়ে ওঠে। যেন ক্ষণিক আগেকার যন্ত্রণা এবই মধ্যে ভুলে গিয়েছে অরুন্ধতী।

জিজ্ঞাসা কবে বিভাস, একটা কথা বলব ?

—কী ? মৃদু স্বর অরুন্ধতীর।

—পাটনায় মা-কে একবার খবর দিলে হয় না ? গোড়া থেকেই তো তুমি কিছু জানাতে মানা কবেছ। শুনলে খুশি হতেন, এসেও পড়তেন। খবর দেব ?

—না।

—তবে, কেষ্টনগরের পিসিমাকে

—না। কাউকে না।

—কিন্তু, কেউ একজন কাছে থাকলে ভালো হত না ?

—না। একটা অভিমানেব জ্বালা যেন এলোমেলো হয়ে অরুন্ধতীব ঠোঁট কাঁপিয়ে ফুটে উঠতে চাইছে।

শান্তভাবেই বিভাস বলে, বেশ। তোমাব মনে জোর থাকলেই হল। তা ছাড়া, হাসপাতালে কোনো অসুবিধেই হবে না। চল, তোমাকে একটা নতুন জিনিস দেখাই।

অরুন্ধতীব দেহটাকে প্রায় একটা হাতের ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে জড়িয়ে টেনে নিয়ে যায় বিভাস।

যেটুকু দেবিব প্রতীক্ষা ছিল, তাও দেখতে দেখতে ফুবিযে গেল। কল্পনা এখন সত্যি হয়ে ঘবেব বাতাসটাকে মাতিয়ে বেখেছে। সময় মতো হাসপাতালে গিয়েছিল অরুন্ধতী, এবং মাত্র একটি সপ্তাহের যন্ত্রণাব বিশ্রাম নিয়ে আবার ফিরে এসেছে ফার্ন রোডে। ভেবে অদ্ভুত মনে হয় বিভাসের, এত সাবধানতার তাড়াহুড়ো, ব্যস্ততা আর পরিকল্পনা সব মাত্র একটা দিনেই শেষবারের মতো চমক দিয়ে শান্ত হয়ে গেল কি করে !

প্রথমে খুবই ভয় পেয়েছিল বিভাস ; নিঃসঙ্গতার ভয়ে মনের ভিতরটাও কেমন ভীরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, এই ভীরুতার ভয়ও যে কত বড় ভুল, সৌম্য পাশে এসে দাঁড়াবার পবই তা বুঝতে পেরেছে। হাসপাতালের একজন

ডাক্তার, ডক্টর মিত্র সৌম্যর পুরনো বন্ধু, তাই কোথাও কোনো অসুবিধে হয় নি।

শুধু সৌম্যই নয়, জয়ন্তীও এসেছিল। প্রসবের দিন তো সমস্ত রাতই অরুন্ধতীর শিয়রে জেগে, বসে কাটিয়ে দিল জয়ন্তী। হাসি মুখে, একটুও ক্লান্ত না হয়ে তার পরের দিনগুলিও অরুন্ধতীর কাছে কাছে থেকে, পাখা করে আর গল্প করেই পার করে দিয়েছে জয়ন্তী। দেখে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছে সকলে। আশ্চর্য!

বিভাসের বুকে কৃতজ্ঞতার নিশ্বাসটা যেন কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। এ-ঋণ কি ভাবে শোধ করা যায়, ভেবে পায় না বিভাস। পায়চারি করতে করতেই বিভাস বলে, ছোটখাট একটা ফাংশনের মতো করলে কেমন হয়? সৌম্য আসবে, জয়ন্তী আসবে, পাটনা থেকে বাবা-মা সকলে আসবেন। কী বল?

কোনো সাড়া না দিয়ে, বারান্দার কোণ-ঘেঁষে ক্লান্ত পাখির মতো সুন্দর চেহারার সব শোভা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকে অরুন্ধতী।

কাছে এসে প্রশ্ন করে বিভাস, আমার কথাটা কি তুমি শুনতে পাও নি, অরুন্ধতী?

হাসতে চেষ্টা করে অরুন্ধতী।—কি বলবে, বল?

—আবার শরীর খারাপ হল নাকি?

—না।

—তাহলে অমন মুষড়ে বসে আছ কেন?

কথা শেষ হয় না বিভাসের। বারান্দায় টাঙানো দোলনার ভিতরে সব শব্দের স্নায়ুজাল ছিঁড়ে একটা নবাগত প্রাণের কান্না থেকে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে। কান পেতে শোনে বিভাস, আর, যেন একটা তীব্র যন্ত্রণার জ্বালা চাপতে গিয়ে তীক্ষ্ণ দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে অরুন্ধতী। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে। বিস্মিত-ভাবে তাকিয়ে থাকে বিভাস। অরুন্ধতীর ওই নিবিড় দুটি ভুরুর মধ্যে কেমন একটা কাঠিন্য আগেও দেখেছে বিভাস। কিন্তু, এখন দেখে মনে হয়, ইস্পাতের দুটি ছোট ছোট বাঁকা ফলকের মতো কঠিন হয়ে কাঁপছে দুটি ভুরু।

বিভাস বলে, ও কি, ওঠ।

—কেন!

—তোমার ছেলে কাঁদছে।

বিড়বিড় করে কি বলে, অরুন্ধতীর গলার একটা অস্পষ্ট ধ্বনি ক্ষীণ আর্তনাদ করে দূরে ছিটকে পড়ে। আস্তে আস্তে দোলনার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় অরুন্ধতী। হাত-পা ছুঁড়ে, গলা ফাটিয়ে কর্কশ চিৎকার করছে দোলনার শিশু। দুঃসহ! হাত দুটো তুলে কান চাপা দিতে যায় অরুন্ধতী; আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থিয়েটারের দানবের মতো হো হো করে হেসে ওঠে বিভাস।—গলার কী জোর দেখছ। বড় হলে ওই ছেলে নিশ্চয় খুব সাহসী হবে।

চমকে উঠে ছটফট করে অরুন্ধতী, যেন গাড়ির চাকায় চাপা-পড়া একটা আহতের শরীর ছটফট করছে। বিভাসের ওই আনন্দের উচ্ছ্বাসটাকে ধমক দিয়েই যেন অরুন্ধতী বলে, চুপ কর, চুপ কর। উঃ। অসহ্য!

চুপ করে বিভাস। মৃদু হেসে বলে, কেন, কি হল!

—ওই জানোয়ারের মতো অলক্ষুনে চিৎকার সব সময় ভালো লাগে!

—জানোয়ার! ওর গলার জোর জানোয়ারের চেয়েও বেশি।

—হয়েছে, হয়েছে! তুমি যে কী করে সহ্য কর!

বিভাস হাসে।—আহা, কানে আঙুল দিলেই কি চুপ করবে! কোলে তুলে নাও, দেখ, দিব্যি চুপ করে গেছে।

অকারণ একটা ঘৃণার শিহরে রি-রি করে অরুন্ধতীর সারা দেহ। তারপরেই চোখ দুটো বন্ধ করে, একটা তিক্ত জ্বালা কোনোরকমে বুকের মধ্যে চেপে রেখে হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে তুলে নেয় অরুন্ধতী।

বিভাস বলে, কেমন, চুপ করল কি না?

অল্প হেসে ধীরে ধীরে সামনে থেকে সরে যায় বিভাস।

কোথায় একটা টিকটিকি ডাকল। সন্ধ্যার ছায়া খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছিল। মনের ভিতরেও একটা ছায়ার কালো মাখিয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অরুন্ধতী। মায়া হয়; সহ্যও হয় না; ইচ্ছে হয়, শক্ত পাথরের উপর আছড়ে ফেলে এই মুহূর্তে ওই ছোট প্রাণের শব্দগুলিকে একেবারে নিঃশব্দ করে দিতে। ভাবতে গিয়েও বুকের মধ্যে একটা সজল ব্যথা কনকন করে ওঠে। ভোলা যায় না, এ যে তারই রক্তের বিন্দু বিন্দু তৃষ্ণা নিয়ে আকাঙ্ক্ষার বুকে জন্ম নিয়েছে! তবু, দেখলেই সর্বাঙ্গে একটা শীতল স্রোত বয়ে যায় কেন!

এক হাতে ছেলেটাকে ধরে অন্য হাতে কপাল টিপে ধরে অরুন্ধতী।

মুখের দিকে চেয়ে দস্যুর মতো লুব্ধ হাতে বুকের কাছে হাতড়ে হাতড়ে কি একটা সন্ধান করছে কচি নরম দুটি ঠোঁট। বুকের নিভৃতে একটা অস্থির আবেগের বন্যা যেন কলকল করে বেজে ওঠে। কিন্তু, কী আশ্চর্য! ছেলেটার চোখে চোখ রাখতে গিয়ে বার বার চমকে উঠছে অরুন্ধতীর দৃষ্টি। আর কোনো সন্দেহ নেই, সেই ভয়ঙ্কর দুর্ভাবনাটাই জয়ী হয়ে গিয়েছে। মাত্র একটি দুর্ঘটনা, কিন্তু একটি মাত্র ঘটনাকেই যে দেহের রক্ত আর বুকের উত্তাপ দিয়ে এতদিন লালন করেছে অরুন্ধতী।

ভাবতে গিয়ে দেহে কিংবা মনে কোথাও এতটুকু জোর পায় না অরুন্ধতী। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল কোনোরকমে। ক্রমশ অবসন্ন হয়ে মেজের উপর বসে পড়ে।

নির্ঘুম অস্বস্তি নিয়ে রাত কেটে যায়। ভোরও হয়।

বিভাস বলে, রাত্রে কি তোমার ভালো ঘুম হয় নি?

—হয়েছে।

—তবে মুখ শুকনো কেন! চোখ দুটোও বসে গেছে।

সাড়া না দিয়ে অন্যমনস্ক হয় অরুন্ধতী। মনটা যেন হঠাৎ সেই সর্বনাশা ভুলের ছায়াটার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে একটা নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব আশ্রয়ে ফিরে যাবার ঠাঁই খুঁজছে। এর আগেও অনেকদিন মনে পড়েছে, বার বার মনে পড়েছে, এবং আজ কেন জানি আরো বেশি করে মনে পড়ছে সেই ছায়াটাকে।

বিভাস বলে, দিন রাত ভের না। আমাকে আবার আজ 'জয়েন' করতে হবে। সীতার মা এলেই আমি চলে যাব। খোকাকে নিয়ে সাবধানে থেক।

অরুন্ধতীর কাছ থেকে যা হক একটা উত্তর আশা করেছিল বিভাস। কিন্তু অরুন্ধতী নীরব। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে বিভাস।

আরো কিছুক্ষণ পরে খটখট শব্দে দরজার কড়া বেজে ওঠে। সীতার মা এসেছে।

দ্রুত কাটছিল সময়। আরো একবার অরুন্ধতীকে সাবধান করে দিয়ে ধীরে ধীরে অফিসে বেরিয়ে যায় বিভাস।

বিভাস চলে যাবার পরও কিছু সময় উন্মন বসে থাকে অরুন্ধতী। গালে

হাত দিয়ে কি ভাবছিল, কে জানে। কিন্তু, এই অন্যমনস্কতার আনন্দটুকুও আর বেশিক্ষণ কপালে সইল না। আবার সেই কান্না শুরু হল!

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে সীতার মা বলে, ছেলেটা যে কেঁদে কেঁদে সারা হল গো! একটু দেখ না!

অরুন্ধতী বলে, তুমিই উঠে দেখ, সীতার মা।

হাত ধুয়ে, ধুতির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে ছেলেটাকে কোলে তুলে নেয় এবং কান্না থামাতে চেষ্টা করে সীতার মা।

একটু শান্ত হয়েছে ছেলেটা। কান্নাও আর শোনা যাচ্ছে না।

সীতার মা বলে, এ আবার কেমন ছেলে হল, বৌদি!

—কেন!

—বাপ-মা কারুরই যে চেহারা পায় নি। কপালটা এত উঁচু কেন, বৌদি?

সামান্য একটা প্রশ্ন। কিন্তু মনে হয়, প্রশ্নের জবাবটা যেন আর কারও অজানা নেই। সবকিছু জেনে আর বুঝে, যেন একটা বিদ্রূপ করবার লোভেই প্রশ্নটা করেছে সীতার মা। অস্ফুট স্বরে অরুন্ধতী বলে, অত জবাব দিতে পারি না। ঘুমিয়ে থাকলে শুইয়ে রেখে কাজ করগে যাও।

আর কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে উঠে যায় সীতার মা।

মাথাটাকে কোলের কাছে ঝুঁকিয়ে শ্রান্ত বিকারের রুগীর মতো চুপ করে বসে থাকে অরুন্ধতী। বাইরেটা শান্ত, কিন্তু ওই শান্ত চেহারার কাঠামো ক্রমশ শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। সীতার মা-র প্রশ্নটা নেহাত নগণ্য। কিন্তু, চরম এক ঠাট্টা যেন লুকিয়ে রয়েছে ওই তুচ্ছ কয়েকটি শব্দের মাঝে। শুধু সীতার মা কেন, হাসপাতালের নার্সও তো ওই একই কথা বলেছিল। ছোট্ট একটা মন্তব্য সকলের সামনেই ঘোষণা করে দিয়েছিল নার্স। বিভাস শুনেছে, সৌম্য আর জয়ন্তীও শুনেছে। মনে পড়ে, ঠিক সহজ স্বাভাবিক হাসি নয়, কেমন অন্যধরনের একটা হাসি কাঁপছিল সকলের ঠোঁটে। সেদিন অন্য কথা মনে হলেও, আজ যে আর কোনো অর্থের ভুলেই মনকে বোঝানো যায় না। ভাবতেও পারা যায় না। অসহ্য!

রগের দুপাশে কেমন দপ্‌দপ্‌ করছিল। হাতের মুঠোটা মৃতের মতো ঠাণ্ডা আর কঠিন। অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে থাকে অরুন্ধতী। তার অন্তর্লোকের পথে যেন কারও পায়ের শব্দ শুনছে।

হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পায় অরুন্ধতী। ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন কোনো

অঘটন ঘটে গেল। কী তীক্ষ্ণ, কদর্য ওই চিৎকার! ছেলেটা কাঁদছিল আবার।

সীতার মা বলে, ছেলে সামলাও, বৌদি। আমার কাজ হয়ে গেছে। চললাম।

বোধহয় শুনতেই পেল না অরুন্ধতী। মুখ ঘুরিয়ে দূরের আকাশের দিকে একটা বঞ্চিত তৃষ্ণার দৃষ্টি ছড়িয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হাত-পা ছুঁড়ে, যেন নিশ্বাসের সব শব্দ থামিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে কাঁদছে ছেলেটা। আর সহ্য হয় না।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়ায় অরুন্ধতী। চোখেব দৃষ্টিটা যেন দুঃসহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। সারা দেহে একটা আততায়িনীর হিংসা নিয়ে ঘরেব মধ্যে ছুটে যায় অরুন্ধতী।

ছোট ঘর। পরিচ্ছন্ন বিছানা। মানুষ নয়, মনে হচ্ছিল, একটা বীভৎস কালো জানোয়ারের প্রাণ বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। দু-চোখ অপলক করে শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকে অরুন্ধতী। কে বলবে, ওই শুয়ে-থাকা দুরন্ত মাংসেব পিণ্ডটা একটা অবোধ শিশুব চেহাবা! কপালের উপর লাল চামড়াটা নীল হয়ে গিয়েছে, বোগা হাত দুটো একটা খুনীর হাতেব মতো। কামাবের হাঁপরের মতো অতিরিক্ত বাতাসে বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে! চিৎকাবের সঙ্গে সঙ্গে গলাব ভিতবে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। এত জোব কোথায় পেল ওই শিশু!

এতক্ষণের চেপে বাখা নিশ্বাসটা এইবাব তপ্ত হয়ে ফেটে পডছিল। মনে হয়, বাইবেব বাতাসে নিশ্বাস না নিলে দম বন্ধ হয়ে যাবে তাব। বাতাস, যেটুকু বাতাস ঘবেব মধ্যে ছিল, কুণ্ডলী পাকিয়ে গলাব মধ্যে আটকে গেল। দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ভীষণ যন্ত্রণা। অন্ধকাব, অন্ধকাব। ঘরের চাবিদিক ছাপিয়ে যেন অন্ধকাব নেমে আসছে! পুরু অন্ধকারটা অবশেষে একটা শরীরি রূপ নিল, হাত, পা, মুখ, মুখের সবগুলি বেখা, চুল পর্যন্ত। আব দেখতে পাচ্ছিল না অরুন্ধতী। চোখের ডিম দুটো ফেটে গিয়ে একটা উষ্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ, তরল পদার্থে সমস্ত মুখ গলে যাচ্ছিল। কঠিন হাতটা আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে শিশুটার মুখেব উপর চেপে ধরল অরুন্ধতী। এবং ক্ষণিক পরে বুঝতেও পারে না, অস্থির কান্নার ধ্বনি কখন শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিছানার পাশেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অরুন্ধতী।

ছাদের কার্নিশে বসে একটা কাক কর্কশ স্বরে অনেকক্ষণ ধরে ডাকছিল। বাতাসের গা থেকে দুপুরের জ্বালা পালিয়ে যায়, হঠাৎ কেমন ঝুমঝুমে হয়ে ওঠে। আকাশের রঙটাও যেন কেমন কেমন মনে হয়। সন্ধ্যায় আর দেরি নেই।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে খুব আশ্চর্য হল বিভাস। ঘরের কোথাও কেউ নেই। এমন নীরব তো কোনোদিন থাকে না। অরুন্ধতীকে দেখা যাচ্ছে না; আর শিশুর কোলাহলও শোনা যায় না।

বিব্রত বিস্ময়ে বিভাস ডাকে, অরুন্ধতী।

প্রতিধ্বনি ফিরে এল। উত্তর নেই।

হতবুদ্ধির মতো ঘরের মধ্যে ছুটে যায় বিভাস, এবং হঠাৎ ভয় পেয়ে কোনো কথাই বলতে পারে না।

অন্ধকারে, একটা পাথরের মূর্তির মতো স্থির, নিষ্কম্প, অবিচল দাঁড়িয়ে রয়েছে অরুন্ধতী। বিভাসের আবির্ভাবটাকে এখনো চিনতেই পারে নি বোধহয়।

আলোর সুইচ্ টিপে দিল বিভাস। একটু শব্দ। আলো। আলো।

—এ কি। অন্ধকারে অমনভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন।

উত্তর দেয় না অরুন্ধতী।

কেমন সন্দেহ হয় বিভাসের। ছুটে এগিয়ে যায় বিছানার কাছে, এবং নিদ্রিত শিশুর নিস্পন্দ মুখ, বুক, গলা এবং হাত, পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরীক্ষা করে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে। নিস্তব্ধ ঘরে বিভাসের আর্তনাদ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করে। মনে হয়, শাবক হারিয়ে একটা কুকুর যেন কাঁদছে কোথাও।

ফার্ন রোডের এই বাড়ির জীবনের অগোচরে কবে যেন একটা ছোট খুশির ঢেউ দেখা দিয়েছিল, ক্ষণিক বুদ্বুদের আলোড়ন তুলেই আবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। দেখতে দেখতে কয়েকটা দিনই তো কেটে গেল। এখন দেখে মনেই হয় না, এই বাড়ির সমস্ত আলো, ছায়া আর শব্দ একটি কচি বুকের নিশ্বাসের শব্দে মধুময় হয়ে উঠেছিল।

বইয়ের পাতা বন্ধ করে মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে আকাশের কালো মেঘের শোভার দিকে বিভাসকে তাকাতে হয়। একটা নরম নবম হাত-পার অবোধ খেলা বার বার মনে পড়ে এবং সেই খেলাকে দুই চোখের উদাস বিস্ময় দিয়ে যেন বুঝতে চেষ্টা করে বিভাস।

এইভাবেই ছোট ছোট মুহূর্ত কেটে যায়। দিনগুলি দরিদ্র, অবসন্ন। রাত্রি নিঃসঙ্গ। নেপথ্যে একটা অসহ্য মরুভূমি দারুণ গ্রীষ্মে দগ্ধ হয়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় বিভাস। সময় হয়ে গিয়েছে, এখুনি অফিসে বেরুতে হবে। কোনো কাজ নিয়ে সেই কাজের আনন্দে ছুটে বেড়াতেও আর ভালো লাগে না। পা দুটো সব সময় কেমন দুর্বহ, ভারী মনে হয়। মুখের উপর ধীরে ধীরে একটা হাত বুলিয়ে নেয় বিভাস। অনেক ময়লা হয়ে গিয়েছে বিভাসের মুখের রঙ। কপালের উপর যেন রোদে-পোড়া একটা ধূসর বিবর্ণতার ছাপ।

দেখতে পায় বিভাস, রান্নাঘরের বারান্দায় হাঁটুর উপর চিবুক পেতে চুপ করে বসে রয়েছে অরুন্ধতী। একটা গভীর সন্দেহ ক্ষণে ক্ষণে মনের ভিতর প্রশ্ন জাগায়, এমন করে সব আশা চূর্ণ হয়ে গেল কেন?

সেদিন সন্ধ্যায় যে-ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেল, তারপর থেকেই যেন বোবা হয়ে গিয়েছে অরুন্ধতী। নেহাত প্রয়োজন ছাড়া আজকাল আর কোনো কথাই বলে না অরুন্ধতী। শুধু প্রায়ই মাঝরাতে, বিছানায় শুয়ে থাকবার সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে একটা নিশ্বাসের ফোঁপানি শুনতে পায় বিভাস। বুক কাঁপে, কিন্তু সামান্য নড়তেও ভুলে যায় বিভাস। মনের সেই নির্ভরতার জোর আর নেই। তবু, মনের উদ্বেগ কখনো শান্ত হতে পারে না।

যে-বিশ্বাস একদিন বিভাসের বুকের প্রতি অস্থি জড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছিল, ক্রমশ তা ভাঙতে আরম্ভ করেছে। ভাবতে গিয়ে কপাল টিপে ধরে বিভাস। অরুন্ধতীর চোখ দুটোর দিকে তাকাতেই কেমন ভয় হয়। সন্দেহ হয়, ওই চোখ দুটি বোধহয় কোনো স্বাভাবিক মানুষের চোখ নয়।

অরুন্ধতীর একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে বিভাস ডাকে, অরুন্ধতী?

সাড়া না দিয়ে বিভাসের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায় অরুন্ধতী।

বিভাস বলে, অফিসের বেলা হল।

—ও। তুমি বস। আমি খাবার দিই।

খেতে বসে বিভাস; আর, নিঃশব্দে পাখার বাতাস করে অরুন্ধতী। এক একটা মুহূর্ত যেন ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতার মধ্যে মরে চলেছে।

খেয়ে উঠে, অফিসে বেরবার আগে হঠাৎ একবার থামে বিভাস। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, যেন একটা নীবব প্রতীক্ষার ভাষা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে অরুন্ধতী।

শান্ত স্বরে প্রশ্ন করে বিভাস।—কিছু বলবে?

অরুন্ধতী বলে, একটা কথা ছিল।

অরুন্ধতীর নীরব কঠিন ঠোঁট দুটিতে কেমন, মধুর একটা হাসি কাঁপছিল। খুশি হয়ে আর আশ্চর্য হয়ে এগিয়ে যায় বিভাস।

—কী, বল?

—অনেকদিন ওদের খবর পাই না। আজ একবার খোঁজ নিও।

—কার? সৌম্যর?

—হ্যাঁ।

—বেশ, নেব। আর কিছু বলবে?

—না।

—তাহলে যাই?

মাথা নাড়ল অরুন্ধতী। মৃদু হেসে বেরিয়ে যায় বিভাস। পুঞ্জ পুঞ্জ অনেক মেঘ জমেছিল আকাশে। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টির পর সব যেন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। অরুন্ধতীর ঠোঁটে অল্প একটু হাসি কেঁপে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বিভাসের মনের সব ভাবনাগুলিও যেন বেদনা ভুলে হেসে ফেলেছে। আজ কতদিন পরে হাসল, অরুন্ধতী! হাসতে গিয়ে বিভাসের দু-চোখে একটা তপ্ততা ছলছল করে।

রুমালটা বেশিক্ষণ চোখের উপর রেখে মুখ মুছতে মুছতে এগিয়ে যায় বিভাস। লাইনের তার ঝন্ ঝন্ করে বাজে। ট্রাম আসছে।

বাড়ি পর্যন্ত আর যেতে হয় না। কলেজেই সৌম্যর দেখা পায় বিভাস।

শান্তভাবে কিছুক্ষণ বিভাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সৌম্য। বিভাসের কাছে আজ আর কোনো কৈফিয়ত দাবি করবার সাহস হয় না; চোখ দুটো দেখলে নিশ্বাসে ব্যথা ধরে যায়। কুণ্ঠিতভাবে সৌম্য বলে, আপনি কষ্ট করলেন কেন! আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতেন।

ক্লিষ্ট হাসে বিভাস।—কষ্ট আর কি! এখন আর কিছুই কষ্ট মনে হয় না।

চুপ করে বিভাসের কথাটাকে বুঝতে চেষ্টা করে সৌম্য।

বিভাস বলে, যাবেন একদিন।

—নিশ্চয় যাব। নতুন কোনো উত্তর খুঁজে পায় না সৌম্য।

বিভাস বলে, আমি তাহলে যাই। বেশ দূরে যেতে হবে তো।

—চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই।

বাস-স্টপ্ পর্যন্ত বিভাসের পাশে হাঁটতে হাঁটতে সৌম্য বলে, আপনি আর কষ্ট করে আসবেন না বার বার। কিছু দরকার পড়লে ফোন করবেন।

—আচ্ছা।

বাসে উঠে চলে গেল বিভাস।

ফুটপাথের উপর দুপুরের রোদ ঝলক দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। হাতঘড়ির দিকে তাকায় সৌম্য। আড়াইটের আগে আজ আর রুটিন শেষ হবে না। অথচ সমস্ত চিন্তা যেন চলতে চলতে থেমে পড়েছে এক জায়গায়, সম্মুখে এতটুকু এগতে পারছে না। মাথার ভিতরটা কেমন শূন্য ফাঁকা, নিরবয়ব, চোখের কোণ দুটো জ্বালা করছিল। রোম-ওঠা, রুগ্ন একটা শালিক কখন উড়ে এল। ফুটপাথের টিউব-ওয়েলের পাশে একটুখানি জলে ডুব দিল কয়েকবার। চতুর্দিক নির্জন। মাঝে মাঝে দু-একজন আসছে, যাচ্ছে। ট্রাম কি বাসের শব্দগুলিকে কোনো শব্দ বলেই মনে হয় না। ঝির ঝির করে একটু হাওয়া দিচ্ছিল। সব রকম অস্বস্তির মধ্যেও এই সিরসিরে বাতাসটুকু ভালো লাগছিল সৌম্যর। সবুজ সুন্দর গাছের পাতাগুলির দিকে চোখ তুলে তাকাল সৌম্য। হঠাৎ মনে হল, শালিকটা বোধহয় আর বাঁচবে না।

ট্রেন যখন ছাড়ল, মনে হয়েছিল, এই পথ একটা সময়কে সঙ্গে নিয়ে ছুটবে; পথের শেষে একটা গন্তব্য রয়েছে। সে-গন্তব্য হয়তো সুন্দর। হয়তো কেন, নিশ্চয়। একটি ছোট, সাজানো ঘর। দেয়ালগুলো চকচকে, মসৃণ, ঈষৎ নীলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দেয়ালে অনেক ছবি, সেইসব ছবির নিচে ছোট ছোট উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা কতকগুলো নাম। টেবিলে অনেক বই। ঘরের একদিকে মেহগনির খাট, মখমলের শয্যা। শিয়রে অনেক ফুল। খোলা জানলা দিয়ে সারারাত অজস্র হাওয়া এবং শাদা ফুটফুটে জ্যোৎস্না অবাধে আসা যাওয়া করে। কিন্তু ·আশ্চর্য, সে-ঘরে কেউ থাকে না। ·

অনেক দিন পরে হঠাৎ দুজন আসে। তাদের পায়ের শব্দ এত বেশি নিঃশব্দ যে, কেউ শুনতে পায় না। মনে হয়, তারা ঘাসের চটি পায়ে হাঁটছে। ঘরের জিনিসগুলো তারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল। কোথা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ আসছিল। মৃদু অথচ উগ্র। ধূপের গন্ধ। বুক ভরে নিশ্বাস নিল দুজনে। পাশাপাশি হেঁটে শয্যার উপর বসল। স্নিগ্ধ একটা আলো ক্রমশ তাদেব মুখ, চোখ, চিবুক—সব কিছু স্পষ্ট করে তুলল। তাবা হাসছিল; এবং বলছিল,.এই ঘব আমবা চেয়েছিলাম, এই শয্যা। এতক্ষণে আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছি।···

ট্রেন যখন ছাড়ল, তখন স্টেশনে অনেক লোক। কেউ রুমাল নাড়ছে, কেউ হাসছে। চাপা কৌতূহল চোখে। এঞ্জিনের বাঁশি বাজল, দীর্ঘ, টানা স্বর। ট্রেনটা দুলে উঠল। তারপব চলতে শুরু করল। প্রথমে আস্তে, একটু একটু জোরে। ক্রমশ অতি দ্রুত। প্ল্যাটফর্মটা আর দেখা যাচ্ছিল না। ঘসা কাচের মতো অস্পষ্ট দু-পাশের গাছপালা, ঘর, জলা, মাঠ—সরে যাচ্ছে, ভালো করে চোখে পড়বার আগেই হারিয়ে যাচ্ছে। দুপুর শেষ হয়ে বিকেল গড়াল। রোদ্দুর নিস্তেজ হয়ে এল। ট্রেনটা ছুটছে। অন্ধকার . হয়ে এল। সন্ধ্যা। নিবনিব আলো। আলেয়া। জোনাকি। শাঁখ বাজছে। রাত্রি। ঝি-ঝির ডাক। ভয় করছে। ঠাণ্ডা হাওয়া, কনকনে। কয়লার গুঁড়ো এসে চোখে লাগছে।

শার্সিটা নামিয়ে ফেলল। আর কত দূর! ঘুমে চোখ জুড়িয়ে এল। ঘুম। ট্রেনটা ছুটছে ....

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। গা মুড়তে কষ্ট হল। অসহ্য যন্ত্রণা। এতটুকু আলো নেই। ট্রেনটা কি চলছে না! নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। ট্রেনটা কি থেমে গেল! অন্ধকার। জন-মানুষের সাড়া নেই। আস্তে আস্তে এগল। সাবধানে নেমে পড়ল। কোথাও কেউ নেই। বিরাট লম্বা একটা সাপের মতো মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে ট্রেনটা। সামনে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। পিছনে, যতদূর চোখে পড়ে, ফ্যাকাশে, ছাই ছাই অন্ধকার, তুলোর মতন ঝুলছে। যাত্রীরা সব মৃত। মনে পড়ল, আরো একজন ছিল, কোলে মাথা রেখে ঘুমচ্ছিল। চুলের গন্ধটা এখনো নিশ্বাসে লেগে রয়েছে। অনেক খুঁজল, নেই। নাম ধরে ডাকল অনেকবার, নেই। নেই, নেই, নেই। বিশ্রী চিৎকার চতুর্দিকে। পা টলছে, নিশ্বাস পড়ছে থেমে থেমে। সামনে একটা দেয়াল। দেয়ালটা ছুঁতে গেল, পারল না। অনেকখানি সরে গেল। যত দূরেই যাই, আরো দূরে সরে যায়। যাওয়া হল না।

সৌম্য ভাবছিল।

এখন থেকে শুধু ভাবনা, চিন্তার স্রোতে ছোট নুড়ির মতো গড়িয়ে চলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। কিছুতেই মন বসছে না, গরম সীসের উপর পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো একটা অনুভূতি ক্রমশ সমস্ত চেতনাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। অথচ মাঝখানে এ রকম ছিল না। কত তাড়াতাড়ি অতীতটাকে ভুলে গেছে, কত সহজে! ভেবে মনে মনে খুশিই হয়েছিল সৌম্য। কিন্তু, এখন আর সে-ভাবে বেঁচে থাকার, একটার পর একটা দিন পার করে দেওয়ার কোনো অর্থই খুজে পায় না। সত্যি সত্যিই এইভাবে জীবনটাকে জোর করে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে লাভ কি? কোনো উত্তর দিয়েই তো আজ আর নিজের মনকে ভোলানো যাচ্ছে না।

ছোট ছোট ঘটনা, ছোট ছোট স্মৃতির মধ্যে আজ আবার অরুন্ধতীকে মনে পড়ছে। ঘরে ঢুকতে ভয় করে, কথা বলতে ভয় করে, এমন কি নিশ্বাস

ফেলতে পর্যন্ত। নিশ্বাসে পুরনো অরুন্ধতীর নিশ্বাস জড়িয়ে যায়। অনেক শপথের কথা মনে পড়ে। সেইসব দিনগুলিকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলে নতুন করে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা অসম্ভব। যেদিকে তাকায়, শুধু একটি মুখের আভাস ফুটে ওঠে চোখে। দেয়াল, আলমারি, বারান্দা, সিঁড়ি—সর্বত্র ওই একটি মাত্র মুখের রেখা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই ঘর অরুন্ধতীর, এই দেয়াল, দেয়ালের ছবি, টেবিলের বই—সব। ভালো হত, যদি এই কয়েক বছরের স্মৃতি মন থেকে একেবারে মুছে ফেলা যেত।

সৌম্য তাকাল। জয়ন্তীকে মনে পড়ছে। জয়ন্তী সুস্থ, স্বচ্ছ, সুন্দর। জয়ন্তীর চোখে এখনো আলো রয়েছে; হয়তো আজো ভালবাসে জয়ন্তী। · জয়ন্তী, আজ আমি তোমাকে চাইছি। আমার একক সত্তায় তুমি এস, তোমার রূপ, তোমার লাবণ্য, তোমার অসহ্য উত্তাপ নিয়ে। একদিন ছিল, যখন আমি তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু, আজ তোমাকে আমার সর্বস্ব দিয়ে ফিরে পেতে চাই। এই দুঃসহ কয়েকটা বছর, একটা স্মৃতির সময় আমি ভুলতে চাই। তুমি এস, জয়ন্তী। পিছনের আকাশটা কী ভয়ানক কালো; কালো মেঘের তলায় রক্তের মতো লাল · ঝড় উঠেছে, আমি হারিয়ে যাচ্ছি। সামনে বিরাট নদী, জলকল্লোল শুনতে পাচ্ছি। ওপারে, অনেক দূরে একটা আলো জ্বলছে, ওখানে একটা ঘর রয়েছে। আমি সাঁতার জানি না ঝড় এগিয়ে এল তুমি আমাকে ওই ঘরে নিয়ে চল। দ্রুত এস, জয়ন্তী, আমার হাত ধর। কিন্তু পিছনে কে ডাকছে! অরুন্ধতী! শাড়ির আঁচল উড়ছে। ও আসতে পারছে না। জয়ন্তী, অরুন্ধতী অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে! · কোথায় যাব আমি। কি করে যাব!

সৌম্য মুখ ঢাকল।

বিরাট শূন্য একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল জয়ন্তী। সরু পায়ে-চলা পথ কতদূর এগিয়ে গিয়েছে। সিঁথির রেখা কপাল ছুঁয়ে চুলের মধ্যে হারিয়ে গেল। পথের দু-পাশে ছোট ছোট ফুল—প্রায় হলদে, একটু বা মেঘ-রঙ; কখনো হালকা নীল, অপরাজিতার মতো। ফুর ফুরে একটু হাওয়ায় তাদের ছোট নরম শরীরগুলো থিরথির করছে। জয়ন্তীর মনে হল, এই ফুল, এই

বাতাস এবং মাঠের এই শান্ত সবুজ সে চেয়েছিল। দূরে, জারুলের ডালে বসে একটা পাখি মিহি চিকন সুরে শিস দিচ্ছিল। বোধহয় মনিয়া। কান পেতে অনেকক্ষণ শুনল জয়ন্তী।

আকাশটা কেমন লাল হয়ে উঠল হঠাৎ। সূর্য ডুবছে। জারুলের ডাল ছেড়ে মনিয়া তার পুরুষের সঙ্গে উড়ে গেল। দিগন্তে, অস্তগামী সূর্য যেখানে শেষ-হাসি ফুটিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, তার কোল-ঘেঁষে ছোট ছোট ডানা মেলে সেই সব পাখিরা অদৃশ্য হয়ে গেল। সূর্য ডুবছে। চতুর্দিক কেমন নির্জন! আশেপাশে তাকাল জয়ন্তী। মেঘ-মেঘ আকাশ, কার্বন-পেপারের উলটো পিঠের মতো ঘন হয়ে উঠেছে পূর্বদিক। যেটুকু বাতাস ছিল, হঠাৎ থেমে গেল। জয়ন্তীর ভয় করছিল। এই থমথমে, মেঘ-মেঘ ছায়াচ্ছন্ন নির্জনতায় নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হল। গাছেব ছায়ায় অন্ধকার ঘন হচ্ছে ক্রমশ, মাঠটাকে মনে হচ্ছে আরো দীর্ঘ, প্রশস্ত, অন্তহীন। পায়েব তলায় ঘাসগুলো কালো হয়ে যাচ্ছে। কেউ নেই। ফুল, কি পাখি, কি গাছ, বাতাস কিছুই নেই। নিঃসঙ্গ। জয়ন্তীর বুকে একটা অসহ্য বেদনা গাঢ থেকে গাঢতর হতে হতে গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠল। মাঠের মধ্যে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পডল জয়ন্তী।

কোন দূর সমুদ্র গর্জনের মতো বহু দূব, অস্পষ্ট একটা ধ্বনি ভেসে আসছিল। চোখে পড়ল, হঠাৎ চোখে পডল, গাছগুলো সব দুলছে। দুলে দুলে নিজেদের ছিঁডতে চাইছে। ছিঁড়ে ছড়িয়ে যেতে চাইছে। হু হু শব্দে ছুটে আসছে হাওয়া। হাওয়ায় পোড়া মাংসের গন্ধ। ঝড়! ঝড উঠল। ঝড় এল এই নিঃসঙ্গতায়। জয়ন্তী উঠে দাঁড়াল। সম্মুখে অচেনা পথ—পিছনের পথ প্রায়-চেনা। জয়ন্তী ছুটতে লাগল। পিছু পিছু একটা বালির পাহাড় যেন ছুটে আসছে। চতুর্দিকের গাছ থেকে কারা যেন—বিরাট, কালো, ভয়ঙ্কর কতকগুলি অবয়ব খসে পড়ে মাঠের মধ্যে গডাতে লাগল। রক্তাভ, কুটিল তাদের চোখ। শাড়ির আঁচল চেপে ধবল। পায়েব পাতায় অসহ্য যন্ত্রণা। মুহূর্তের জন্য শাড়িব আঁচলটা আলগা হল। জয়ন্তী পালাতে চাইল। কিন্তু একবার মুখ থুবড়ে মাটিতে পডে গেল, আবার উঠল, ছুটতে লাগল।

যেতে যেতে এক নদীর সঙ্গে দেখা। শবীরে আর এতটুকু জোব নেই। চোখদুটো ঝাপসা, চোখের মনিদুটোয় অসহ্য ব্যথা। ঝড় কী থেমে গেল।

এই পথ কতদূর গেছে ? এই নদীটা কী আগেও ছিল। ;···নদীর ধারে·একটা আচ্ছন্ন কান্না! কে! একে আমি আগে দেখি নি। একজন পুরুষ! কিন্তু ও আমার পরিচিত।· ·

পা টলছিল জয়ন্তীর। ভালো লাগছে না এই নিঃসঙ্গতা। আশ্রয় চাই, নিভৃত শান্তি।· আমি ওর কাছে যাব। জয়ন্তী এগিয়ে গেল।

·· আমাকে চিনতে পার ?· না! · চিনতে পারছ না! আমি জয়ন্তী।· · ও। কিন্তু এই অন্ধকার, এই রাত্রি এই নদীটা।·· কথা বল না, কথা বল না। আহা! দেখছ না, ঝড় থেমে গেছে। তারা ফুটেছে আকাশে। নদীর ঐ জল, জলের নাম জ্যোৎস্না।·· বড় ভালো লাগছে তোমাকে!...বড্ড ক্লান্ত আমি, ঘুম আসছে। কতদিন পরে একজনকে পেলুম, তোমাকে পেলুম! তোমাকে আমি ছাড়ব না। কিন্তু না, না, কোনো কথা শুনব না, সৌম্য। তুমি চুপ কর। সৌম্য, সোনা আমার, আমি তোমায় ভালবাসি, বড ভালবাসি। কত ভালবাসি, তুমি জানবে না। . সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে। কি দুবন্ত আগুন যে সারা শরীরে ধরে রেখেছি। সৌম্য, আমাকে জড়িয়ে ধর, যেন আমি পালাতে না পারি। ঠোঁট দুটো জ্বলছে আর পারছি না। সৌম্য, আমায় চুমু খাও। লক্ষী, সোনা! আমি তোমার বুকে মুখ ঘষব, নাক ঘষব। তোমার মধ্যে ভেঙ্গে ছড়িয়ে দেব নিজেকে! ওকি, সরে যাচ্ছ কেন! যেও না আমি যাব, আমাকে সঙ্গে নাও

জয়ন্তী, এস না। নদীটাকে আমার বড় ভয়। এই নদী আমি ভালবাসি। অথচ সাঁতার জানি না। ওই নদীতে আমি ডুবে যেতে পারি।

ভয় কী! আমার হাত ধর। ও কি, এভাবে যেতে নেই সামনে জোয়ার, নদীটা ফুলে উঠেছে · জল জল তুমি পারবে না। সৌম্য, তোমার মুখ আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। সৌম্য

জলের মধ্যে ভেসে গেল জয়ন্তী। কিন্তু কিন্তু কোথায়! নদীটা ফুঁসছে, নদীটা হাসছে। সৌম্য ডুবে গেল·· আমার সৌম্য ডুবে গেল...

.

আকস্মিক আলোড়নে ঘুম ভেঙ্গে গেল জয়ন্তীর। অথবা, ঘুময় নি

জয়ন্তী, মুহূর্তের আচ্ছন্নতা এসে সমস্ত চিন্তাকে এলোমেলো করে দিয়েছিল। আশ্চর্য! ঘামে ভিজে গিয়েছে সমস্ত শরীর। মুখের ভিতরটা গলা পর্যন্ত লবণাক্ত। নিশ্বাস দ্রুত। অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়। সর্বাঙ্গে একটা অস্বস্তি, স্নায়ুর পরতে পরতে মিশে গিয়েছে। ভালো লাগছে না। চিৎকাব করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

জয়ন্তী উঠে দাঁড়াল। বিকেল হয়ে গেছে। গুল্মোরের ডালে সূর্যাস্তের রঙ। এ-ছবি যেন আগেও কোথায় দেখেছে, অথচ মনে পড়ছে না। নিচের তলায় কুকুর ডাকছে, আরো অনেকক্ষণ ডাকবে। একটি শিশুর হাত ধরে একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে। তাকাচ্ছে এদিকে। সঙ্গের বাচ্চাটাকে আঙুল তুলে কী দেখাল। শাড়ির আঁচলটা বুকের উপর গুছিয়ে নিল জয়ন্তী। তারপর সরে দাঁড়াল।

আকাশটা ক্রমশ কালো হয়ে যাচ্ছিল। পাশের বাড়ি রেডিও বাজছে। সুন্দব পুরুষ কণ্ঠে গান। কথাগুলো বড় ভালো। উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল জয়ন্তী। পৃথিবীতে এত সুর, এখনো এত গতি, কিন্তু, জয়ন্তী নীরব, দমবন্ধ ঘড়িব কাঁটার মতো স্থির, শান্ত, অবিচল। সত্যি, এই জীবন, এমনভাবে জীবন ধাবণ আব ভালো লাগে না। বৈচিত্র্যহীন, নিরস দিন-যাপন! ভালবাসা, ভালবাসাব গর্ব—সবকিছুর উপর মনটা মাঝে মাঝে কেমন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মন বুঝলেও, শবীবকে সব সময় বোঝানো যায় না। তখন মনে হয়, নিজেব এই অহঙ্কাববোধ একেবারে অর্থহীন, অসার। হয়তো এইসব চিন্তাব কোনো মূল্যই নেই সৌম্যর কাছে। একটা সামান্য খেয়ালের বেশি জয়ন্তীকে আব কোনো মূল্যই হয়তো সৌম্য দেয় না। তাহলে এই অসাব দম্ভকে সযত্নে আড়াল করে বাখাব অর্থ কী। মিথ্যে, মিথ্যে। জয়ন্তীব ইচ্ছে করে, বায়বাহাদুবের মুখেব দিকে তাকিয়ে সেই পুবনো কথাগুলিকেই আবাব নতুন কবে শোনে। কিন্তু, পব মুহূর্তেই সৌম্যব কথা ভাবতে গেলে মন কেমন কবে, নতুন কোনো জীবনেব কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না। পুবনো চিন্তাব স্রোতে অনায়াসে নিজেকে ভাসিয়ে দেয় জয়ন্তী। জানলায় চোখ বেখে আজও সৌম্যব কথা ভাবতে বড় ভালো লাগে। মনে মনেই প্রার্থনা কবে জয়ন্তী, তুমি এস, তুমি এস। এই ভালো-লাগা এবং প্রার্থনা কেন বা কিসেব জন্য, জয়ন্তী নিজেই কি তা জানে! তবু, ফটকের বাইরে একটা মানুষেব চেহারা যখন ধীবে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে, বুকেব

মধ্যে একটা দ্রুতলয় উত্তেজনা অনুভব করে জয়ন্তী; নিশ্বাস চঞ্চল হয়। আগেকার মতোই তরতর করে হেঁটে অনেকগুলো সিঁড়ি নেমে সৌম্যকে ডেকে আনবার জন্য ছুটে যায় জয়ন্তী।

ঠিক তেমনিভাবেই আসে সৌম্য, প্রায়ই আসে। বরং, আগের চাইতে বেশিই যেন আসে।

ঈষৎ দ্রুত, শান্ত পায়ে একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙে নিচে আসছে জয়ন্তী। জয়ন্তীর সামনে এসে দাঁড়ায় সৌম্য।

জয়ন্তী বলে, কী এত দেরি করলে যে! ছ-টা কী এই বাজল।

জয়ন্তীর গলায় একটা অভিমানের সুর কাঁপতে গিয়েও কাঁপে না। তলানির মতো জমে থাকে।

সৌম্য হাসে।—দেরি! সত্যি কী দেরি করলাম! হয়তো তাই। সৌম্যর হাসিটা অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক। কিন্তু সহজ নয়।

জয়ন্তী হেসে বলে, চল, কথা খরচ না করে ওপরে যাই।

অথচ, জয়ন্তীর পা দুটো কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তেমন চঞ্চল হয় না।

সৌম্য বলে, তাই চল।

বলেই দু-পা এগিয়ে যায় সৌম্য। আজকাল ও নিজেই বেশ যেতে পারে।

উপরের ঘর জয়ন্তীর ঘরটা এখনো তেমনি সাজানো, গোছানো, পরিপাটি। দক্ষিণের জানলা দিয়ে প্রচুর হাওয়া আসে, অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। সৌম্য এবং জয়ন্তী দুজনেই প্রায় সারাক্ষণ আকাশ দেখবার চেষ্টা করে; কিন্তু আকাশ না দেখে, আকাশেরই মতো বিরাট, নিরবয়ব একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সৌম্যই এইবার প্রথম কথা বলে।

—তারপর, কেমন আছ, বল? রিল্‌কের ট্রানস্লেশনটা নিশ্চয়ই পড়ে ফেলেছ।

—হ্যাঁ, পড়েছি। কয়েক জায়গায় বুঝতে পারি নি। একটু সময় নিয়ে জয়ন্তী বলে, তোমার কাছে বুঝে নেব।

—বেশ তো। দ্বিতীয় স্বর, শব্দ খুঁজে পায় না সৌম্য।

দক্ষিণের জানলা দিয়ে গোধূলির আলো ঢোকে। ছোট ছোট হাওয়া। আলো, হাওয়ায় ছোট বড় অসংখ্য মুহূর্ত খেলা করে।

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে জয়ন্তী।—বলতে ভুলে গেছি! আজ নিউ-মার্কেটে তোমাদের হিষ্ট্রির সেই পঙ্কজবিমলকে দেখলুম। ছেলে কোলে বউয়ের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেচারা খুব লজ্জা পেয়েছিল ; আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। বউটি কিন্তু বেশ চালাক চতুর। ওই অতবড় হিস্ট্রির ডিক্রেনাবিটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিচ্ছে খুব!

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে যেন হাসিটাকে লুকিয়ে ফেলতে চায় জয়ন্তী। অবশ্য সত্যিই ও হাসছিল কিনা, বোঝা যায় না।

সৌম্যও হাসে। তারপর বলে, তোমাদের মিনতি বসুরও তো বিয়ে হল নিরঞ্জনের সঙ্গে। এই তো সেদিন। আহা, ওদের অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল।

সৌম্যর কথাগুলো শেষের দিকে ভারী হয়ে ওঠে।

ঘরের মধ্যে দুটো চাপা নিশ্বাস ছুটে বেড়ায়।

হঠাৎ উঠে দাড়িয়ে জয়ন্তী বলে, তুমি একটু বসো। আমি এখুনি আসছি। আবার হুট্ করে চলে যেও না যেন।

নিঃশব্দে মিলিয়ে যায় জয়ন্তী। চুড়ির রিন্‌বিনে একটু মিষ্টি ধ্বনি কিছুক্ষণ মন ছুঁয়ে থাকে।

সৌম্য বসে থাকবে যতক্ষণ জয়ন্তী না আসে। জয়ন্তী আবার আসবে। বসবে মুখোমুখি।

দক্ষিণের জানলায় সন্ধ্যাটা ধীরে ধীরে রাত্রি হয়ে যাবে।

প্রথমে শাদা, তারপর অল্প নীল, আবছা হলুদ মেশানো সিল্কের ফিতের মতো একটুখানি আলো ছড়াতে ছড়াতে ক্রমশ একটা আগুনের সাপ হয়ে অরুন্ধতীর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরল। ভয় করছে। ওপাশের জানলাটা বন্ধ, হাওয়া ঢুকছে না। বিভাস নেই, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ছিল। কিন্তু এখন আর ওকে দেখতে পাচ্ছে না অরুন্ধতী। দেয়ালে পাণ্ডুর রোদ। উঠনের কোণে মরা বাচ্চাটাকে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে জাগাতে চাইছে একটা চড়ুই। মাথা ঘুরছিল অরুন্ধতীর। চোখের ভিমে উদ্ভিদের মতো কতক-গুলো লাল সূক্ষ্ম শিরা ফুটে উঠল ; মণিদুটো ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াল। অরুন্ধতী দেখল, নীল, পিঙ্গল একটা হিলহিলে আগুনের

সাপ তার শরীর ঘিরে ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে।· সোঁ সোঁ—কেমন বিশ্রী শব্দ। নিশ্বাস জ্বলছে। ঘামছিল অরুন্ধতী। সাপের শরীরটা হঠাৎ টুকরো টুকরো হয়ে লক্ষ লক্ষ সাপের মতো ছড়িয়ে পড়ল। অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে আগুনের একটা প্রচ্ছন্ন অবয়ব তৈরী হল। হাত, পা, মুখ, শিশুর হাত, প্রায় একটা শিশুর মতো শরীর। নড়ছে, দুলছে, বাতাসে ভাসছে। হাত-পাগুলো জেলির মতো। এতক্ষণ মাড়ি বের করে হাসছিল। হঠাৎ দৌড়তে শুরু করল। অরুন্ধতীর ভয় করছিল।··সামনের সিঁড়িগুলো কী অন্ধকার। অন্ধকারে ও পড়ে যেতে পারে। শিশুটাকে ধরবার জন্য উঠে দাঁড়াল অরুন্ধতী।...কিন্তু...যেতে পারছে না। পিছন থেকে কে টেনে ধরেছে ; আপ্রাণ চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারছে না অরুন্ধতী। জন্তুর মতো বীভৎস, ভয়ঙ্কর, রোমশ একটা শরীর ; ছুঁচলো দুটো দাঁত ঠোঁটের পাশ দিয়ে বাইরে ঝুলে পড়েছে। নিজেকে ছাড়াতে চাইছিল অরুন্ধতী। পারল না। সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটা হঠাৎ দুটো কর্কশ, পুরু, নোংরা হাত বাড়িয়ে পাঁজাকোলা করে অরুন্ধতীকে বুকের মধ্যে তুলে নিল। দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঝন্ ঝন্ এক মুহূর্তের শব্দ। জন্তুটা তাকে নিয়ে পালাচ্ছে। কী একটা উলটে গেল।· হাঁসফাঁস করতে লাগল অরুন্ধতী। গালে, গলায়, বুকে, সমস্ত শরীরে উষ্ণ জ্বলন্ত একটা নিশ্বাস দমকে দমকে ছড়িয়ে পড়ছে। অসহ্য যন্ত্রণা। সর্বাঙ্গ জ্বলছে।

রবিবারের বিকেল। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। সৌম্যদের বাড়ির উঠনে এখনো তবু কিছুটা রোদ রয়েছে। রাত্রে এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলো এখন স্বচ্ছ, সবুজ ; রৌদ্রে উজ্জ্বল।

নিজের ঘরে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে পথের দিকে তাকিয়ে ছিল সৌম্য। পার্টিশানের ওদিকে একটা ছুতোর মিস্ত্রী কি কাজ করছে। কদিন পরেই আবার নতুন ভাড়াটে আসবে এ-বাড়িতে। আজ সকালেই বলে দিয়েছেন বিনয়বাবু।

একটা অধ্যায় শেষ হয়ে আবার একটা নতুন অধ্যায়ের শুরু! অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করছিল সৌম্য।

পিছনে, বিছানায় বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল জয়ন্তী। সৌম্যকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে একটু অবাক হল।

—কী, চুপ করে রইলে যে।

জয়ন্তীর প্রশ্নে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু হাসল সৌম্য।—ভাবছি, সন্ধ্যেটা কি ভাবে কাটানো যায়।

—চল, মেট্রোয় একটা ভালো ছবি হচ্ছে। দেখে আসি।

এমনভাবে কথাগুলো বলল, যেন আগে থেকেই মনে মনে কথাগুলো তৈরি করে নিয়েছিল জয়ন্তী।

এক মুহূর্ত কী চিন্তা করল সৌম্য। তারপর বলল, মন্দ বল নি। কিন্তু—

বোধহয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল সৌম্য, কথা শেষ করতে পারল না। পাশের ঘরে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

শব্দটা মন দিয়ে শুনল সৌম্য। তারপর এগিয়ে গেল।

—হ্যালো? হ্যাঁ, আমি সৌম্য। কি খবর? কী! তাই নাকি! কতক্ষণ? আচ্ছা, আমি আসছি।

এ-ঘরে বসে জয়ন্তী শুনল, সৌম্য রিসিভার রেখে দিচ্ছে। ফিরে আসতেও বেশি সময় লাগল না। কেমন ফ্যাকাশে, বিবর্ণ মুখ সৌম্যর, যেন এই মাত্র কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদ শুনে এল।

জয়ন্তী উঠে দাঁড়াল।--কি ব্যাপার! কার ফোন?

ভাবলেশহীন, নির্বিকার মুখ তুলে তাকাল সৌম্য।—আমাকে একবার ফার্ন রোডে বিভাসবাবুর বাড়ি যেতে হবে, জয়ন্তী।

—কেন, কি হয়েছে? খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল জয়ন্তীকে।

সৌম্য বলল, তুমিও তো আসতে পার। এস। সব বলছি।

দ্বিতীয় কোনো কথা বলবার সুযোগ পেল না জয়ন্তী। সৌম্য এগিয়ে গিয়েছিল। মাথার চুলে রোদ্দুর লেগেছে। ছেলেমানুষের মতো সরল মনে হচ্ছিল সৌম্যকে। এইবার সিঁড়ির বাঁক ঘুরল।

জয়ন্তী সৌম্যকে অনুসরণ করল।

সামান্য স্টোভ থেকে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে, কি সম্ভব, বিভাস বুঝতে পারে নি। বস্তুত, ইদানীং অরুন্ধতীর চালচলন, মনোভাব বিভাসকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করেছিল। আকস্মিক এই পরিণতি বিভাসকে কিছুটা বিস্মিত ও বিমূঢ় করে ফেলল।

আগুন অবশ্য বেশিদূর ছড়াতে পারে নি। স্টোভটা উলটে যাওয়া, এবং অরুন্ধতীর জ্ঞান হারানো—সবই এত নিঃশব্দে ঘটেছে, এত দ্রুত ও সংক্ষেপে যে, কারুর পক্ষে কিছু আঁচ করা সম্ভব নয়। ঘরের বাতাসে একটা পোড়া গন্ধ আলোড়িত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল বিভাসের, হাতের বই ফেলে রেখে দ্রুত ছুটে এসেছে। আর একটু দেরি হলে কি হত বলা যায় না।

এখন সৌম্য আর জয়ন্তীর সম্মুখে এইসব বিবরণ দিতে গিয়ে বার বার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল বিভাসের। নিশ্বাস কাঁপছিল। মুখের দিকে আর তাকানো যায় না। এত বেশি ভাঙাচোরা, অসহায় এবং জীর্ণ।

সৌম্য এবং জয়ন্তী পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু, এই মুহূর্তে বিভাসকে কি বলবে ভেবে পেল না। নিচু মুখে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

অরুন্ধতীর চেহারাটাও যেন এখন আর সহ্য করা যায় না।

এলোমেলো নিস্পন্দ হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল অরুন্ধতী। দেহের শাদা চাদরটা থেকে যেন তখনো মৃদু ধোঁয়া উড়ছিল। ডান দিকের গালের নিচের দিকটা ঝলসে গিয়ে রসাল লিচুর মতো টসটস করছে। কপালের কাছে মাথার চুলগুলো শাদা-শাদা, যন্ত্রণায় বেঁকে গিয়েছে ঠোঁটের কোণ দুটো। শাদা চাদরের আড়ালে হাত-পাগুলো দেখা যাচ্ছিল না। জ্ঞান ফেরে নি তখনো।

নিষ্পলক চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সৌম্য। তারপর ঠোঁট দুটো অল্প নড়ে উঠল, কিন্তু কোনো কথাই স্পষ্ট হল না। খাটের বাজু ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল সৌম্য।

জয়ন্তীর মুখে বেদনার ছায়া। অনেকক্ষণ পরে উন্মন স্বরে বলল, কিন্তু এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু হবে বলে মনে হয় না। একটা ব্যবস্থা অন্তত

করা দরকার। সাংঘাতিক কিছুই অবশ্য হয় নি, তবু। সৌম্য, তুমি কি একবার ডক্টর মিত্রের কাছে যাবে?

বোধহয়। বিভাসকে একটু তৃপ্ত ও সুস্থ করবার জন্যেই কথাগুলো বলল জয়ন্তী।

জয়ন্তীর কথার উত্তরে ক-পলক নীরবে তাকিয়ে থাকল সৌম্য। তারপর ব্যস্তভাবে ছুটে গেল। জয়ন্তী দেখল, সৌম্যর গতি কি অসম্ভব দ্রুত!

মাঝখানের সময়টুকু নিটুট শূন্যতায় ভরা।

অরুন্ধতীর শিয়রে বসে জয়ন্তী ডাকল, বিভাসবাবু?

আপন মনেই কি ভাবছিল বিভাস। জয়ন্তীর ডাকটা যেন শুনতে পায় না।

জয়ন্তী বলে, এইখানে বসুন, বিভাসবাবু। অমন উতলা হলে কিছুই হবে না।

মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে অরুন্ধতীর পায়ের কাছে বিছানার উপর বসে পড়ে বিভাস।

একটু পরেই ফিরে আসে সৌম্য। ডাক্তারেরও আসতে দেরি হয় না।

পোড়া জায়গাগুলো পরীক্ষা করে, প্রয়োজন মতো ব্যবস্থা করে চিন্তিত মুখে বাইরে বেরিয়ে এলেন ডক্টর মিত্র। সেই যে একবার বসেছে বিভাস, তারপর আর ওঠে নি, কোনো কথাও বলে নি।

ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে সৌম্যও বেরিয়ে এল। পিছনে জয়ন্তী।

—কেমন দেখলেন, ডক্টর মিত্র? দ্বিধাগ্রস্থভাবেই প্রশ্নটা করল সৌম্য।

—Any way, not bad। ডক্টর মিত্র বললেন, ওষুধ দিয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরবে বলে মনে হয়।

জয়ন্তী প্রশ্ন করে, আশা দিয়ে যাচ্ছেন তো?

ডাক্তার হাসেন।—আশা আমাদের দিতেই হয়, জয়ন্তী দেবী। সিরিয়াস্ কিছুই হয় নি। শীঘ্রি সেরে উঠবেন। তবে—

একটু থেমে, দম নিলেন ডাক্তার। রিস্টওয়াচে সময় দেখলেন।

—কি জানেন, ট্রাবলটা সেন্ট্ পার্সেন্ট মেন্টাল। সেখানে আমাদের হাত তো খুব কম। কেস্ হিস্ট্রি যতটুকু শুনলাম বেশ জটিলই মনে হয়। বলতে পারেন, নিউরোসিস্। পরস্পর বিরোধী কোনো আঘাতে বা মন-বিরোধী কোনো একটি ঘটনায় এইরকম হওয়া সম্ভব। মস্তিষ্ক অসার

হয়ে তখন নিজেকে নিজেই আঘাত করতে চায়। আঘাতের পদ্ধতিও হয় অত্যন্ত স্থূল; উদাহরণ শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। After all, life is a vast canvas, it can hold many colours। কিসের পরিণতি যে কিসে দাঁড়ায়, we cannot guess, even just a second before it actually happens। আবার আমরা সেই পুরনো বৃত্তে ফিরে যাচ্ছি, where, there are more things

আবার রিস্টওয়াচের দিকে তাকালেন ডাক্তার মিত্র।—যাক্, চিন্তার বিশেষ কিছু নেই। পরে আমাকে জানাবেন।

ডাক্তার চলে যাচ্ছিলেন। মোটর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল জয়ন্তী।

শঙ্কা, শূন্যতা ও অগৌরবের মধ্যে একটা অসহ্য জ্বালায় সৌম্য দগ্ধ হচ্ছিল। যেটুকু বাকি ছিল, অহঙ্কারের সেই শেষটুকুও আজ চূর্ণ হয়ে গেল। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দু-হাতে চোখ কচলায় সৌম্য। কত রাত এখন।

ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল জয়ন্তী।

সৌম্য জিজ্ঞাসা করল, বিভাসবাবু কি করছেন, জয়ন্তী?

—বসে আছেন অরুন্ধতীর কাছে।

—উনি কী সারা রাত বসেই থাকবেন। বোধহয় খাওয়া হয় নি ভদ্রলোকের।

জয়ন্তী বলল, আমি দেখছি ওকে। তুমি ভেব না।

জয়ন্তী চলে যাচ্ছিল। যাবার আগে একবার ফিরে তাকাল।—দাঁড়িয়ে কেন, সৌম্য। তুমি বরং ওই সোফাটায় খানিক বিশ্রাম কর। ক্লান্ত হয়েছ।

স্নেহ-বিচলিত স্বর জয়ন্তীর, সৌম্যর উত্তর শোনবার অপেক্ষা করল না।

সেখান থেকে সরে বিভাসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল জয়ন্তী। দু-হাতে কপাল টিপে তেমনি মাথা হেঁট করে বসে ছিল বিভাস। এখনো জ্ঞান ফেরে নি অরুন্ধতীর। শুধু, শাদা চাদরে ঢাকা বুকটা যেন নিশ্বাসের বাতাস লেগে একটু একটু কাঁপছে।

আস্তে আস্তে ডাকল জয়ন্তী, বিভাসবাবু?

উত্তর দেয় না বিভাস। চোখও তুলল না।

আরো একটু এগিয়ে, বিভাসের প্রায় কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে জয়ন্তী বলে, এবার চলুন, বিভাসবাবু।

—কোথায়!

—খাবেন চলুন। আমি ব্যবস্থা করেছি।

—না।

—কেন!

—খিদে নেই। বিভাসের মুখটা যেন বড় বেশি করুণ হয়ে ওঠে।

জয়ন্তী বলে, তাহলে পাশেব ঘরে চলুন। বিছানা হয়েছে, শুয়ে পড়বেন। ভাবনা কী, অরুন্ধতীব কাছে এখন আমিই থাকতে পাবব। ডাক্তাব বলে গেলেন, ভয়েব কিছু নেই।

যেন জীবন-মবণেব সংকটে অভিভূত এই বাড়িব রুগ্ন আত্মাকে অমৃতবাণী ধ্বনিত কবে শুনিয়ে দিচ্ছিল জয়ন্তী।

বিভাস আর কিছু বলতে পাবল না। ইচ্ছে না থাকলেও ধীবে ধীরে উঠে পাশেব ঘবে চলে গেল।

আবো কিছুক্ষণ পবে, সমস্ত বাড়িটা স্তব্ধ, নিঃশব্দ হয়ে যাবাব পর অরুন্ধতীব শিয়ব ছেড়ে বাবান্দায় বেবিয়ে এসে ধীব, স্থিব ও শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্তী। মনে হয় একটা স্বার্থহীন ভালবাসাব প্রতিজ্ঞা যেন শিখা হয়ে জ্বলছে। শীতকালেব বাত্রি। হালকা কুয়াশা-ছড়ানো আকাশে ছোট, ম্লান কয়েকটি তাবা। সিবসিবে একটু হাওয়া দিচ্ছিল। সপ্তর্ষির বুক হতে শীত-শিহবন উৎসাবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বাত্রিব বাতাসে।

ভাবতে অবাক লাগে জয়ন্তীব। সৌম্য, বিভাস আব অরুন্ধতী—তিন-জনেই এখন গভীব ঘুমে অচেতন। দেখে মনেই হয় না, মাত্র কিছুক্ষণ আগে পযন্তও একটা ভয়েব ছায়া কাঁপছিল এই বাড়িব সর্বত্র। মনের ভিতর হঠাৎ যেন একটা দুঃস্বপ্নেব বাত্রি ভোব হয়ে গিয়েছে, আলো জেগেছে, আব তাবই সঙ্গে যেন জেগে উঠেছে হাজার পাখিব কলকাকলি। আব তো নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় না। নিজন বাবান্দায় দাঁড়িয়ে প্রাণ-ভবা একটা নিশ্বাস বুকেব ভিতর ববণ কবে নেয় জয়ন্তী। কোথায় শূন্যতা! সকল-পাওয়া আনন্দ যে ছড়িয়ে বয়েছে চতুর্দিকে।

আকাশেব ঠাণ্ডা, মৃত আলোব দিকে দুই চোখেব স্মিত দৃষ্টি তুলে নিঃশব্দ অভ্যর্থনাব একটি সুন্দর মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্তী। এই তো

জীবন। কী মধুর, মমতা-ভরা জীবন। আজকের মতো এমন রাত্রি, এমন নিজস্ব আনন্দময় মুহূর্ত আর কখনো বুঝি আসবে না। জয়ন্তী তার সর্বস্ব দিয়ে এই অনুভূতিটুকু ধরে রাখতে চাইছিল।

ঘরের ভিতর থেকে একটা অস্ফুট প্রার্থনা ভেসে এল।

—জল।

জেগে উঠেছে অরুন্ধতী। জল চাইছে। আহা, বেচারা!

দ্রুত ছুটে গেল জয়ন্তী।